নীড়ের পাখিরা

কমল লাহিড়ী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট
এঁকেছেন
গৌতম রায়

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক
১৩৬৮

মা-বাবা ও বাবুর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
—কমল।

সকাল বেলায় হঠাৎই ঘুম ভেঙ্গে গেল সুব্রতর। রাঙ্গা মাসীমার চিৎকারে বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য মনে হলো। মানসী অনেক আগে উঠে ঘরের কাজে লেগেছে। গতরাত্রে ওর সঙ্গে অহেতুক কথার দ্বন্দ্বে মনও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আজকাল মানসীও সমানভাবে রাঙ্গা মাসীমার সঙ্গে কথার পাল্লায় নিজেকে এগিয়ে দিয়েছে। রাত দিন শুধু চিৎকার আর এই নেই ও নেই এসব শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে জীবনের উপরই বিতৃষ্ণা এসে যায়।

রাঙ্গা মাসীমার কথার শব্দগুলো এবারে দোতলা থেকে নিচের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন সুব্রতকে এভাবে শুয়ে থাকা দেখলে ঘটনাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা চিন্তা করেই উঠে পড়ে সুব্রত। গত দুদিন শেভ না করায় দাড়ি বড় হয়েছে বেশ। একগাল দাড়ি নিয়ে অফিসে যেতে লজ্জাই করে। চোখে জল দিয়ে দাড়ি কামাবার জিনিস নিয়ে আয়নার সামনে এল সুব্রত। আয়েস করে ব্রাশে সাবান লাগিয়ে গালে মাখাবার সময়টাতেই ঘরে ঢুকল মানসী।

না এভাবে আর সত্যি একসঙ্গে থাকা যায় না। তোমাকে বার বার বলছি, যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা কর। তুমি কিন্তু কোন কথাই কানে নিচ্ছ না।

ঝড়ের পূর্বাভাষ। এসব কথা শুনতে শুনতে সুব্রত এখন অভ্যস্ত। তবুও একটু মজা করার জন্যই ব্রাশটা নামিয়ে মানসীর একটা হাত ধরে বলে, আহা! কি হয়েছে বলবে তো। সেই সকাল থেকে এক কাপ চায়ের আশায় বসে আছি। সে তো মিললোই না, সাত সকালেই রামায়ণ গান শুরু করলে।

আহা কচি খোকা—কিছুই জানে না যেন। এ বাড়িতে এক মুহূর্ত যে থাকবে, সেই বুঝে যাবে কোন্ কথার কি মানে হয়। আর সব জেনেও উনি সাধুবাবা সাজছেন।

চা-টা দেবে। সুব্রত একটু সরে যায়। গামছায় হাত মুছতে মুছতে মানসী বলে, সেই কথাই তো বলতে এসেছি। কাল বিকেল থেকে চিনি ফুরিয়েছে। এখনও রেশন তোলা হয় নি। তাই রাঙ্গা মাসীমার কাছে একটু চিনি চাইতে গেছি। আর অমনি যা মুখে এল বলে গেলেন।

তা তুমিই বা সাতসকালে রাঙ্গা মাসীমার কাছে চিনি চাইতে গেলে কেন? চিনি না থাকলে তিনিই বা দেবেন কি করে। মানসীর দিকে তাকিয়ে সহজভাবেই বলে সুব্রত।

ওর দিকে তীব্র চোখে তাকায় মানসী। তারপর বলে—থাম থাম, যা জান না, সে সব নিয়ে কথা বলো না। আমি জানি রেশনের চিনি এলে প্রথমেই রাঙ্গামা ঠাকুরের নামে কিছুটা সরিয়ে রাখেন। তাই চাইতে গিয়েছিলাম, আর উনি —।

শুনে রাখ সুবি, রোজ দিন সকালবেলায় উঠে ঠাকুরের নাম করব না কি তোর বউয়ের মুখঝামটা খাব সে কথা তুই-ই বলে দে আমাকে। বলি, কি এমন কথা আমি বলেছি তোর বউকে—সাত সকালে যা মুখে এল তাই শুনিয়ে এল। আচমকা দরজার কাছে রাঙ্গা মাসীমার আবির্ভাবে কথার মাঝখানেই চুপ করে যায় মানসী। সুব্রতও সামনে এগিয়ে যায়। রাঙ্গা মাসীমা দুজনার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার বলেন—

মেয়েই না হয় পেটে ধরি নি—তা বলে মেয়ের দুঃখ বুঝি না। তোর বউকে কথা বললেই মেয়ের খোঁটা দেয়। শেষের কথাগুলো বলতে বলতে রাঙ্গা মাসীমার গলা ভারী হয়ে আসে। মানসী বড় বড় চোখে সুব্রতর দিকেই তাকিয়ে থাকে। রাঙ্গা মাসীমাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে সুব্রত বলে ঠিক আছে রাঙ্গামা, বউ তোমাকে যা-যা বলেছে সে-সব কথা আমি শুনব। কিন্তু এখন তো বেলা হয়ে গেছে। তুমি চট করে আমাকে এক কাপ চা করে দেবে। তোমার বউকে দিয়ে তো সে আশাও নেই।

সুব্রতর কথায় রাঙ্গা মাসীমা উঠে দাঁড়ান। আর কিছু কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলেন না। একবার মানসীর দিকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সুব্রতর দাড়ি কামান এখন হবে না। সময় থাকলে বাজার করে এসে কাটা যাবে। আলনা থেকে জামা নিয়ে গায়ে দিয়ে সুব্রতও বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

একলা ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী। প্রতিদিন একটা না একটা কিছুতে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। মেসোমশাই অবসর নিয়ে ঘরে বসার পর থেকে ক্রমশঃ সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। রাঙ্গা মাসীমাও ভীষণ খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেছেন, মানসীও আর আগের মত নেই। এক এক সময় নিজের কাছেই যেন নিজেকে অপরিচিত মনে হয়। বাপ-মা হারানো বোনপোকে রাঙ্গা মাসীমা নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশী আদরে বড় করে তুলেছেন। ভুপতি-অনাদি-শ্যামল রাঙ্গা মাসীমার তিন ছেলে তো ফুলদা আর বৌদি বলতে অজ্ঞান। ওরা মাত্র এই সব কথা গায়ে মাখে না। সুব্রত আর মানসীও রাঙ্গামা ও মেসোমশাইকে বাবা-মার মতই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। মানসীর বিয়ের পর প্রথম কয়েকবছর তো রান্নাঘরের কাছেই যেতে দেন নি রাঙ্গা মাসীমা। তাঁর বড় আদরের সুবির বৌ সে যাবে

উনুনের আগুনে রান্না করতে। তিনি বেঁচে থাকতে তো নয়-ই। এই রকম স্নেহ আর ভালবাসার মধ্যে বিয়ের পর পাঁচটা বছর কেমন সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়েই কেটে গিয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝেই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা মানসীর সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করে ফেলত। তবে সে সব সুব্রতর নিবিড় ভালবাসায় নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে ভুলে থাকার চেষ্টা করত। রাঙ্গা মাসীমাও নানানজনের পরামর্শ মত মাদুলি-তাবিজ—কিছুই বাদ দিতেন না। আজ শীতলাতলা—কাল বুড়োশিবের মন্দির—পরশু ফকির বাবার দরগা মানত লেগেই থাকত। অনাদি আর ভূপতি পালা করে ডাক্তার দেখিয়ে আনতো।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ মানসীর আনন্দময় জীবনের এক জায়গায় মস্ত একটা ছেদ টেনে রেখেছেন। আর সেই চরম পরাজয়ের জন্যই বোধ হয় মেজাজটা এভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সময় মানুষকে সব কিছুর মধ্যেই মানিয়ে চলার সাহস যোগায়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মানসী যেন ততই আস্থা হারিয়ে ফেলছে। নারীত্বের পূর্ণ বিকাশের কোনও রসদই বোধহয় আর মানসীর দেহের কোষে বাসা বাঁধবে না। সুব্রতর সঙ্গে ডাক্তারের আলোচনার মধ্যে এই চরম সত্যটুকু জানার পর থেকেই সমস্ত কিছুর উপর যেন বিষিয়ে উঠছে মন।

চা না খেয়েই বোধ হয় বাজারে গেছে সুব্রত। ওদিকে মেসোমশাইকে দুধসাবু দিতে হবে। অনাদি-ভূপতির অফিসের সময়ও হয়ে আসছে। শ্যামলের কলেজের ভাত ঠিক সময়ে না হলে অনর্থ বাধবে। তাই নিজের জীবনকথার চিন্তায় ছেদ টেনে বাইরে পা বাড়াতে গিয়েই বাধা পেল মানসী। ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল শ্যামল।

কি ব্যাপার বল তো? দু'কাপের জায়গায় এক কাপ চা তো জুটলোই না, বরং তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে গ্রেটমাদারের কিছু আশীর্বাদ সকালবেলায় মাথায় নিতে হল।

ভালই তো সকালে মায়ের আশীর্বাদ পেলে সারাদিন বান্ধবীদের নিয়ে বেশ আনন্দে কাটাতে পারবে। নাও সর, দেখি আবার বাজার এলো কি-না।

এই দেখ যাচ্ছো কোথায়? প্লীজ বৌদিভাই, আসল কাণ্ডটা কি বলবে তো। শ্যামল এগিয়ে এসে মানসীর হাত ধরে বলে। মানসীর ওপরই ওর যত আবদার। দু'জনাই দু'জনকে সমানভাবে ভালবাসে। পরম আপন করে ছোট ভাইয়ের মত শ্যামলকে কাছের মানুষ করে নিয়েছে মানসী। হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ও বলে, নতুন কিছু নয়। রোজ যা হচ্ছে তাই। রাঙ্গামার কাছে চায়ের চিনি চাইতে গেছি আর অমনি উনি বাপের বাড়ি তুলে যা মুখে এল বলে গেলেন। সকালবেলায় ঠাকুরের চিনি দিয়ে চা খাওয়া নাকি অপরাধ। সুতরাং র‍্যাশন থেকে চিনি না আসা পর্যন্ত তোমাদের আজ চা মিলবে না, বুঝেছ?

যাহ্ বাবা! এই কথা, আমি ভাবলাম, আবার বুঝি তোমাদের ঠিকুজীর মিল নিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে হারুর দোকানেই চায়ের কাজটা সেরে আসি। আর কেটলিটা দাও তোমার আর ফুলদার জন্যও দু'কাপ আনতে হবে তো? কথাটা বলেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল শ্যামল।

মানসী রান্নাঘরে এসে দেখল, রাঙ্গা মাসীমা দুধসাবু তৈরী করছেন। ওদিকে গেলে আবার কিছু কথা হবে এই ভেবে ও ভূপতির ঘরের দিকে পা বাড়াল। বাড়ির মধ্যে সবার চেয়ে বেলা করে ওঠে ভূপাত। ওকে একটু সমীহ করেই চলে মানসী। কোনও অভিযোগ বা মন খারাপ হলে ভূপতির ঘরেই কিছুক্ষণ বসে থাকে। ভূপতির স্বভাবও আলাদা। কথা বলে কম। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে বই নিয়েই শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। মানসী সে-সবের সমঝদার শ্রোতা।

মাথা নীচু করে ভূপতির বইয়ের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মানসী। ভূপতি আড়চোখে ওকে দেখে একটু রসিকতার চেষ্টা করে।

কি ব্যাপার আজ তোমার ছুটি নাকি?

ছুটি তো চাকুরে বউদের হয়। আমার মত মূর্খের তো ছুটি মেলে না—আদায় করে নিতে হয়।

ওরে বাবা এ যে, রণচণ্ডী মূর্তি। রক্ষে কর বাবা। তা কি মনে করে এই সকাল বেলায়।

কিছু না এমনি। নির্লিপ্ত জবাব দিয়ে মানসী একটা বই দেখতে থাকে। পরিবেশটা লঘু করার জন্যই ভূপতি এবার বলে, তোমার জন্যে কাল একটা সুন্দর কবিতা লিখেছি শুনবে?

যার জন্যে লিখেছ তাকেই শুনিও ভাই। বই বন্ধ করে কিছুটা এগিয়ে আসে মানসী। ভূপতি কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে বলে, আচ্ছা আগে নামটা দেখ—তারপর কবিতা শুনো। একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে লেখে, "যেখানে আকাশ নীল" কাগজটা মানসীর সামনে ধরে বলে, দেখ তো নামটা কেমন?

মানসী কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাইরে সুব্রতর গলার আওয়াজ পেয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বাজার নিয়ে এসেছে সুব্রত। বারান্দাতেই চোখা-চোখি হল। একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকেই এগিয়ে গেল মানসী। মেশোমশাই বাইরের ঘরে বসেছেন কাগজ নিয়ে। রাঙ্গা সীমাও বসে আছেন কাছে। রান্নাঘর থেকে ওদিকটা স্পষ্ট দেখা যায়। আনাজগুলো আলাদা সরিয়ে রেখে মাছ নিয়ে কলতলায় গেল মানসী।

অনাদি মুখ ধুচ্ছে। মানসীকে দেখে একটু হেসে সরে দাঁড়াল। তারপর খুব আস্তে বলল, সকালের ঘোলাটে ওয়েদারটা কেটেছে বলে মনে হচ্ছে, এবারে কি এক কাপ চায়ের আশা আছে দেবী!

বাড়িতে আশা নেই—কেটলি নিয়ে ছোট গেছে হারুর দোকানে। তিনি ফিরলে চেষ্টা করা যেতে পারে। মানসীও ফিসফাস করেই জবাব দেয়। মাছ কাটতে কাটতে সুব্রতর ওপর আর এক পশলা অভিমান বুকে জমতে থাকে। আজ দিন বুঝেই ছোট ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসেছে।

শীতের সকাল এমনিতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। তারপর একলা হাতে সব কিছু জুগিয়ে তাল সামলানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মন ভাল থাকলে রাঙ্গা মাসীমা মানসীর কাজে সাহায্য করেন। কিন্তু কথান্তর হলে রান্নাঘরের ছায়াও মাড়াবেন না। হয় গীতা না হয় আধ্যাত্মিক রামায়ণ নিয়ে মেসোমশাইর পাশে বসে থাকবেন। মাছ কেটে ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মানসী।

রান্না করতে করতে সময় এগিয়ে চলে। সুব্রতর সঙ্গে ভূপতিও ঘরে ঢোকে। আসন বিছিয়ে বসেই সুব্রত বলে, কই হয়েছে, এদিকে তো ন'টা বেজে গেছে। প্রতিদিন এভাবে লেট করে অফিসে যেতেও লজ্জা করে।

তা আমি কি করবো! আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করি নাকি? মানসী রাগের সুরেই জবাব দেয়।

সব বুঝেও যেন ইচ্ছে করেই কথা শোনায় সুব্রত। ভূপতি মানসীর মুখের ভাব লক্ষ্য করেই বলে, এই নাও আবার শুরু হল। কি যে তুমি কর না ফুলদা, এমনিতেই আজ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তার ওপর তুমি পবন দেবের স্তব শুরু করলে। সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যাবে আজ।

চুপ কর—সব সময় সব কিছু নিয়ে হাসি-মস্করা ভাল লাগে না। দয়া করে জলটা নিয়ে বসে পড়, আমি ভাত বাড়ছি। শাড়ির আঁচলে হাত মুছে দুটো থালা নিয়ে ভাত বাড়তে থাকে মানসী।

চুপ করে খেয়ে চলে সুব্রত আর ভূপতি। অনাদিও পাশে এসে বসে। পরিবেশটুকু বুঝে নিয়ে দাদাদের পাশে একটা জায়গা করে নেয়। গম্ভীর মুখে ওর সামনেও ভাতের থালা এগিয়ে দেয় মানসী।

প্রতিদিন শত কাজের মধ্যেও সুব্রতর অফিসে বেরনোর সময় মানসী কাছে থাকে। আজ বিশেষ কাজ না থাকলেও অনেকটা ইচ্ছে করেই ওঘরে গেল না। সুব্রতও ডাকলো না ওকে। বারান্দা থেকেই মানসী দেখল, সুব্রত আর ভূপতি একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারপর অনাদিও বেরল।

এখন অখণ্ড অবসর মানসীর। শ্যামল সেই যে হারুর দোকানে বেরিয়েছে এখনও ফিরল না। এই হয়েছে আর এক ছেলে। দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পিছলে পড়েও হাসি-গান আর গল্পের আসরে নিজেকে মাতিয়ে রেখেছে। ওর জন্যও কি রাঙ্গা মাসীমার কাছে কম কথা শুনতে হয়! তিনি তো বলেনই ইদানীং সুব্রতও কথা বলতে শুরু করেছে। তা সে-সব কথা মানসী গায়ে মাখে

না। শ্যামলকেই বরং আদরের ছলে বুঝিয়ে দেয়, যত আড্ডাই দাও পড়াটা আগে শেষ কর তাহলেই সব মানিয়ে যাবে।

সুব্রত আর ভূপতি ব্রজমোহনবাবুর পুরনো অফিসেই কাজ করে। রিটায়ারের আগেই ওদের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রথমে সুব্রত পরে ভূপতি। সাহেবদের আমলে তো বলার কিছুই ছিল না। এক জায়গায় বাবা চাকরি করলে তার ছেলে সেখানে কাজ পাবে তারপর তার ছেলে। এই ধারাই চলে এসেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পালটেছে সব কিছুই। সাহেবদের কোম্পানীতে মারোয়াড়ী আর গুজরাটি ব্যবসাদারেরা অংশ নিয়েছে। আগে নাম ছিল "জনসন অ্যান্ড নিউবোল্ড এন্টারপ্রাইস লিমিটেড"। এখন হয়েছে, জনসন এ্যান্ড আগরওয়ালা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড। তা নামে কি এসে যায়। ব্রজমোহনবাবু কোনও দেশী ব্যবসায়ী সাহেবের পায়ে তেল মাখান নি। তেলই যদি দিতে হয় খাস ইংরেজ সাহেবের পায়ে দেওয়াই মঙ্গল। ওরা গুণী মানুষের কদর বুঝত। সেই আসল ইংরেজ সাহেবদের একজন ছিল গুডলেংথ। আটত্রিশ বছর অক্লান্তভাবে কাজ করে গুডলেংথের গুডবুকেই ছিলেন ব্রজমোহনবাবু। আর তারই পুরস্কার স্বরূপ সুব্রত আর ভূপতিকে অফিসে ঢোকাতে পেরেছেন। অনাদি বি-এ পাস করার পরও চেষ্টা করেছিলেন। হয়ত হয়েও যেত ওর কাজটা। কিন্তু অনাদি নিজেই বাবার সে কাজ নেয় নি। কারও সুপারিশে চাকরি করতে ওর নিজেকে ছোট মনে হয়। উঠতি রাজনীতিবিদ অনাদির সেই কথা শুনে ব্রজমোহনবাবু কিছুক্ষণ গুম হয়েছিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তাহলে যে কাজটা খুব সম্মানের, সেটা তাড়াতাড়ি খুঁজে নিয়ে করলেই তো আমি খুশী হই। এভাবে কাজ না করে বাইরে ঘুরে বেরিয়ে আর ইনক্লাব বলে সময় কাটালে অপরের কাছে ভাল লাগলেও আমার কাছে সে-কাজ সুখকর নয়।

অনাদি কিন্তু নিজের কথা রাখতে পেরেছিল। বলতে গেলে নিজের অক্লান্ত চেষ্টাতেই সার্ভিস কমিশনে দরখাস্ত করে এই চাকরিটা পেয়েছে। খাস গভর্ণমেন্টের দপ্তরে চাকরি। আর সবচেয়ে বড় কথা অনাদির রাজনীতি এখানে পুরোদমে চলছে। অফিস ইউনিয়নের প্রধানদের একজন সে। বাড়িতে অনাদির এই রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে বহুবার অনেক তপ্ত আলোচনাও ঘটে গেছে। কিন্তু সে-সবে ওর কিছু যায় আসে না। মাসের প্রথমে সামান্য কিছু সুব্রতর হাতে ধরে দিয়ে ও নিজের ইউনিয়ন আর পার্টি নিয়েই মেতে থাকে।

সংসারের যত দায় সব সুব্রতর। ওরা সবাই মাসের টাকা ফুলদার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত। অবসর নেবার পর ব্রজমোহনবাবু এক সঙ্গে যে টাকা পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে মাথা গোঁজার একটা জায়গা ভালই করেছিলেন। শহরতলীর এই জায়গাটাও অনেক আগেই কেনা ছিল। একবার গুডলেংথ সাহেবের সঙ্গে একটদ

ইন্সপেকশানে টিটাগড় আসতে হয়েছিল। ফেরার পথে এই জায়গাটা ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়। পরের মাসের এক রবিবার নিজে এসে সব দেখে শুনে জায়গা ঠিক করেছিলেন। নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠছে। বেশ সস্তাতেই পেয়েছিলেন বলে, এক সঙ্গে ছয় কাঠা জায়গাই বায়না করেছিলেন। স্ত্রীর কাছেও কিছুদিন গোপন রেখেছিলেন কথাটা। অবসর নেবারও সময় হয়ে এসেছে। তাই সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েই সব কথা খুলে বলেছিলেন।

আগে একতলাই ছিল। তিনখানা ঘর, রান্নাঘর আর টিউবওয়েল। রাঙ্গা মাসীমা বলেছিলেন, এই বেশ হয়েছে। জায়গা তো রইল, পরে ওরা নিজেদের পছন্দমত করে নেবে।

কিন্তু দিনের পর দিন সংসারের খরচ যেভাবে বেড়ে চললো, তাতে ছেলেদের কারও আর সে ইচ্ছে রূপ পেল না। তবুও ওর মধ্যে সুব্রত রাঙ্গা মাসীমাদের জন্য ওপরতলায় একখানা ঘর আর ঠাকুরঘর উঠিয়েছে। এইটুকুতেই সবাই খুশী।

প্রথম প্রথম অফিস করতে কষ্ট যে না হয়েছে তা নয়। তবুও শ্যামবাজারের সেই অন্ধগলির বাসাটা থেকে তো ঢের ভাল। অনেকটা ফাঁকা—খোলামেলা। বাড়ির সামনে রাঙ্গা মাসীমা পুজোর জন্য বেশ কিছু ফুলগাছও লাগিয়েছেন। মানসীও আগেকার বাসায় হাঁফিয়ে উঠত। এখানে সবুজের ছোঁওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পেরে ও ভীষণ খুশী।

সব কিছুই ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎই আজ কয়েক মাস হল কেন যেন বাড়ির পরিবেশটাই পালটে গেছে।

শ্যামল বোধহয় আজও ক্লাস ফাঁকি দেবে। বেলা প্রায় দুপুরে শেষ হতে চললো, এখনও বাবুর দেখা নেই। মানসী স্নান সেরে রাঙ্গা মাসীমার ঘরের দিকে গেল। এতক্ষণ রাগ করে তো থাকেন না তিনি। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ব্রজমোহনবাবুকে স্নান করিয়ে মানসীই খাইয়ে দিয়েছে। তখন তো পাশের বাড়িতে ছিলেন রাঙ্গা মাসীমা। বাতের অসুখটা বাড়ার পর থেকে ব্রজমোহনবাবু নিজে আর কিছুই করতে পারেন না। ঠিক পারেন না তা নয় ডান হাতের আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে যাওয়ায় খেতে কষ্ট হয়। তাই হয় রাঙ্গা মাসীমা না হয় মানসী ওরাই তার খাওয়া থেকে শুরু করে সব কাজের যোগান দিয়ে যায়।

যা ভেবেছিল মানসী ঠিক তাই। খবরের কাগজটা বুকের ওপর রেখে মেসোমশাই ঘুমুচ্ছেন আর রাঙ্গামা তার পায়ের কাছে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছেন। দৃশ্যটা দেখে ভীষণ হাসি পেল মানসীর। কিন্তু হাসির শব্দে যদি জেগে ওঠেন, তাই মুখ টিপে হেসে রাঙ্গা মাসীমার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, রাঙ্গামা—উঠুন অনেক বেলা হয়েছে।

পাশ ফিরে উঠে বসলেন রাঙ্গা মাসীমা। মাথা তুলতেই শ্যামলের সঙ্গে

চোখাচোখি হয় মানসীর। ওকে কড়া সুরেই কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শ্যামল শূন্য কেটলিটা মাথায় নিয়ে হাত জোড় করে এমন এক করুণ অভিনয় করে ওকে চুপ করতে বলল, যা দেখে চুপ না করে উপায় নেই।

ব্রজমোহনবাবু পাশ ফিরে শুলেন। রাঙ্গা মাসীমাও উঠেছেন! মুখের থমথমে ভাবটা সামান্য ঘুমের আমেজে আরও ভারি ভারি লাগছে। মাথা নীচু করেই দরজার দিকে এগিয়ে যায় মানসী। শ্যামলকে গালাগাল দিতে দিতে রাঙ্গা মাসীমা পিছনে চললেন।

নবাবপুত্তুর—বৌদির আদরে আদরে একেবারে বাদশা হয়ে উঠেছেন। দিন নেই রাত নেই শুধু টো-টো কোম্পানির ম্যানেজারি করা আর ভাইয়েদের অন্নধ্বংস।

অপরাধীর মুখে কলতলায় গিয়ে দাঁড়ায় শ্যামল। রাঙ্গা মাসীমা বকতে বকতেই রান্নাঘরে ঢোকেন। মানসী শ্যামলের দিকে দুষ্টুমিভরা মুখে তাকিয়ে ইশারায় ওকে স্নান সেরে নিতে বলে। রাঙ্গা মাসীমার আসন পেতে দিয়ে জল ভরতে যায়। মানসীর ওপর রাগ আর অভিমান এখন অনেকটা কমে এসেছে। মানসী জানে, এখন রাঙ্গামা ওকে আর কিছুই করতে দেবেন না। তিনজনার খাবারও নিজেই বাড়বেন তারপর অভিমান আর অভিযোগের সুরে কথা বলতে বলতে খাওয়া শেষ করবেন। এটা এখন নিয়মমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও কেন যে সেই মুহূর্তগুলোতে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না মানসী! এখন রাঙ্গা মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে সকালবেলার কথার জবাবগুলো যে সত্যিই বেশ অন্যায়ভাবে বলা হয়েছিল সেটুকু বুঝে, মনে মনেই খুব লজ্জা হতে লাগল ওর।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। মানসী আজ দুপুরে ঘুমিয়ে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছে। এমনিতে দুপুরবেলায় খুব একটা ঘুম হয় না। আজ কিন্তু বই পড়তে পড়তে সহজেই দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছিল। বিছানায় শুয়ে স্বপ্নের ছবিটাই চিন্তা করছিল মানসী।

দিনেরবেলায় খরাপ স্বপ্ন দেখলে নাকি কাউকে বলতে হয়। কিন্তু সুব্রতর ফিরতে তো রাত আটটা। স্বপ্নের কথাটা মনে হওয়ায় মানসীর এখন হাসি পেল। মাথা নেই মুণ্ডু নেই অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। এত জিনিস থাকতে মানসী দেখল, প্রকাণ্ড একটা মাঠ—কোথাও গাছ-গাছালির চিহ্ন নেই। সেই খাঁ-খাঁ প্রান্তরে মানসী একা ছুটে চলেছে। তার সামনে উড়ছে একটা বড় সুন্দর প্রজাপতি। ঝড়ও উঠেছে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উড়ছে প্রজাপতি। আর মানসী সেটাকে ধরার জন্য দু'হাত সামনে মেলে ধরে প্রাণপণে ছুটছে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না। একবার পড়েও গেল। শরীরের কয়েক জায়গায় কেটে রক্ত পড়ছে। কিছুই যেন খেয়াল নেই মানসীর। ওর লক্ষ্য সেই রং-বেরংয়ের সুন্দর ডানামেলা বড় প্রজাপতির দিকে। প্রজাপতিটা হঠাৎই এবার

মানসীর মাথার উপরে ঘুরতে লাগল। লাফিয়ে উঠে ধরার চেষ্টা করল ও। প্রজাপতির পাখায় আঙুলগুলো ছুঁয়ে গেল শুধু। হলুদ আর লালের ছোপ লেগে গেল হাতে। আবার লাফিয়ে উঠল মানসী। কিন্তু এবারে আর নীচে নামতে পারল না। প্রজাপতিটাও উড়ে যাচ্ছে মানসীও শূন্যে ভেসে চলেছে। এইরকম একটা অবস্থার মধ্যেই ভয় পেয়ে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নের ছবিটা স্মৃতির গভীরে বন্ধ করে রূঢ় বাস্তবে ফিরে এল মানসী।

বিকেলের চা জলখাবার করতে হবে। কাজও পড়ে আছে। ঠিকে ঝির বাসনমাজা, ঘর মোছা সবই হয়ে গেছে। কল থেকে সে খাবার জল ভরছে রান্নাঘরে। এক গ্লাস জল খেয়ে ঘর থেকে বাইরে এল মানসী। আজও বেশ শীত পড়বে। এখনই গা শিরশির করছে। শীতের সময় সব ভাল শুধু দিনেরবেলাটা বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যায়।

শ্যামল এখনও ঘুমুচ্ছে। ওর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উপরে গেল মানসী। রাঙ্গামা বসে আসন সেলাই করছেন। সত্যি, এক একসময় এত ভাল লাগে রাঙ্গা মাসীমাকে যা বলার নয়। এতখানি বয়স হয়েছে এখনও চশমা ছাড়াই কেমন সুন্দর সেলাই করেন। রেশনের চালের ছোট ছোট কাঁকরগুলো পর্যন্ত একটা একটা করে বেছে ফেলেন। কাজে যেন কোনও ক্লান্তি নেই।

রাঙ্গা মাসিমার প্রথম যৌবনের সব কথাই মানসীর শোনা। সুব্রতর সঙ্গে বিয়ের পর দুপুরবেলায় কাছে বসিয়ে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রাঙ্গামা নিজেই তার বিগত দিনের ইতিহাস শুনিয়েছেন মানসীকে।

মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকেছিলেন ব্রজমোহনবাবু। অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা-মা। তা' সেই পঁচিশ টাকাতেই কেমন গুছিয়ে সংসার চালাতেন রাঙ্গা মাসীমা। বিয়ের পর পাঁচ বছর কেটে গেলেও কোনও সন্তান না হওয়ায় বাড়ির সবাই বেশ বিরূপ হয়ে উঠেছিল রাঙ্গা মাসীমার উপর। এমন কি মেসোমশাইও যেন সবসময় কেমন মনমরা হয়ে থাকতেন। শাশুড়ী তো ছেলের আবার বিয়ে দেবার ব্যবস্থাই করছিলেন। তাতে কিন্তু ব্রজমোহনবাবুই বেঁকে বসেছিলেন। স্বামীর কাছে কোনও কথাই গোপন রাখতেন না রাঙ্গামা। সেবার বাপের বাড়ি কালনায় বেড়াতে গিয়ে এক নাগা সন্যাসীর কাছে হাতে দেখিয়ে একটা মাদুলি পরে এলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলেছিলেন মন্ত্রপূত সেই মাদুলি ধারণের এক বছরের মধ্যেই নাকি রাঙ্গামা পুত্রবতী হবেন। তবে একটা শর্ত ছিল। সেই এক বছরের মধ্যে নিজের আত্মীয়-পরিজনের কোনও প্রিয়জনকে পুষ্যি নিতে হবে।

সে এক অসাধ্য ব্যাপার। ব্রজমোহনবাবু তো স্ত্রীর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাঙ্গা মাসীমার চোখের জলের ফলেই হোক বা সন্ন্যাসী

ঠাকুরের মাদুলির ফল ফলার জন্যই হোক, পর পর ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটলো, সে সব কিন্তু বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না। মাদুলি ধারণের দু'মাসের মধ্যেই রাঙ্গা মাসীমার শাশুড়ী হঠাৎই কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর ঠিক তারই এক মাসের মধ্যে রাঙ্গা মাসীমার জীবনে একসঙ্গে বিষাদ আর আনন্দের ছায়া নেমে এল।

রাঙ্গা মাসীমার ছোট বোন থাকত বর্ধমানে। ভাল ঘরে বরেই বিয়ে হয়েছিল তার। সেখান থেকেই চিঠি এল বোনের জামাই বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে আর সেই শোক সামলাতে না পেরে ছোট বোন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুব্রত তখন চার বছরের ছেলে। খবর পেয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন রাঙ্গা মাসীমা। ব্রজমোহনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বাপ মা মরা ছেলের ঝক্কি সামলাবার দায় থেকে রেহাই পেয়ে তারাও খুশী হয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় ব্রজমোহনবাবুর মনও অনেক নরম হয়ে উঠেছিল। দৈবকে মেনে চললে হয়ত মাদুলির ফল ফলতেও পারে! কাজেই তখন রাঙ্গা মাসীমার কোনও কাজেই বাধা দেন নি তিনি।

তা সত্যিই দৈবফল মিলল। সুব্রতকে পুষ্যি নেওয়ার দু'বছরের মাথায় ভূপতির জন্ম হ'ল। তারপর চার বছরের ব্যবধানে অনাদি আর শ্যামল। ওদের বড় হয়ে ওঠার পরও অনেকদিন পর্যন্ত ওরা জানতো না সুব্রত ওদের আপন ভাই নয়। সেটা অবশ্য এখনও মনে করে না। মানসীও এই পরিবারে বিয়ে হয়ে এসে সুখীই হয়েছে। কিন্তু এদের কাছে অনেক পেয়েও এদের সব চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারছে কোথায়! আর ঠিক সেইজন্যই বোধহয় সংসারের ছবিটা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। হয়ত এসব কিছুই নয়। তবুও মানসীর অন্তরে যে অসহনীয় জ্বালা দিন রাত ওকে ঘুণ পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে সেকথা বুঝবে কে? সুব্রতর মনও যেন আজকাল কেমন উড়ু উড়ু হয়ে উঠেছে। পুরুষের মন মেয়েরা বুঝলেও নিজের এই চরম দুর্বলতা নিয়ে শাসনও চলে না। তাই অদেখা ভাগ্য-লিপিকেই অকারণে কাটাকুটি করে নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে মানসী।

চায়ের জল হয়ে গেছে। বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন বন্ধ করে চা তৈরি করতে থাকে মানসী। রাঙ্গা মাসীমা আসন রেখে ঘুরে বসেন। মেসোমশাইকে চা খাইয়ে রাঙ্গামার কাছেই দু'কাপ চা নিয়ে বসে মানসী।

চায়ের কাপ ডিস নিয়ে উঠে আসছিল মানসী। ব্রজমোহনবাবু বললেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও তো মামণি। কেমন যেন দপ দপ করছে মাথাটা। মানসী কাপডিস রেখে এগিয়ে গেল। রাঙ্গা মাসীমা ধমকের সুরে বলেন, মাথা ধরেছে বলছো তো সেই সকাল থেকে। বললাম ওষুধ-টষুধ কিছু আনিয়ে খাও। তো কানেই তুলছো না কথা।

আরে না-না তেমন কিছু নয়। তোমার শুধু একটুতেই ডাক্তারী ওষুধ না হলে মন ভরে না।

তা তো ভরেই না। ঠেলা যে আমাকেই সামলাতে হয়। তখন তো আর হাত বুলুনিতে অসুখ সারে না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। খোকাদের জলখাবার করতে হবে। তা না—ওনার মাথা টিপে দাও।

রাঙ্গা মাসীমা বেশ রেগে গেছেন। মানসী কি করবে ভেবে পায় না। তাই পরিবেশটা সহজ করতেই ও বলে, আপনি ব্যস্ত হবেন না রাঙ্গামা। ওদের আসার এখনও দেরি আছে। আমি মেসোমশাইর মাথাধরা ছাড়িয়েই জলখাবার করবো।

ব্যস্ত আমি হইনি বউমা। দেখ না কাল রাতদুপুর থেকে জেগে বসে ছিল। নিজেও ঘুমোয় নি আমাকেও ঘুমুতে দেয়নি। সকালেই আমি সুব্রতকে বলতে যাচ্ছিলাম। তা' দিল আমাকে বলতে। একটুতে তো কিছুই সারে না। তাই ভয় করে কিসে কি হয়!

মানসী নীরবে ব্রজমোহনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। চোখ বুঁজে আরামের নিঃশ্বাস ফেলেন ব্রজমোহনবাবু। রাঙ্গা মাসীমা আর কথা না বলে ঠাকুর-ঘরের দিকেই এগিয়ে যান। ছোটবেলায় বাবা মারা যান মানসীর। কাকা জ্যাঠাদের সংসারে অনেক দুঃখেই বড় হয়েছে মানসী। বিয়ের পর বাবার ব্যথাটা ব্রজমোহন-বাবুর স্নেহছায়ায় ভুলেই গিয়েছিল। মানসীর অনেক দুঃখের কথাও ব্রজমোহনবাবুর জানা।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। রাঙ্গা মাসীমা ঠাকুরঘরে আলো দেখিয়ে বাইরে এলেন। এবার উঠতেই হবে। আজ শনিবার। অথচ আজও সুব্রত তাড়াতাড়ি ফিরবে না। অফিসের পর আবার কোথায় নাকি পার্ট-টাইম হিসেব দেখার কাজ করে। সুব্রতর কাছ থেকে ক্রমশই যেন দূরে সরে যাচ্ছে মানসী। প্রতি মুহূর্তে এই একটা কথার চিন্তা সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন আর কোনও সান্ত্বনাই মানতে চায় না সেই অশান্ত মন। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সমস্ত কিছুর ওপর। একটা ছোট্ট শিশুর মিষ্টি হাসিভরা মুখ শুধু মনের মুকুরে এঁকে কোথাও উধাও হয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। অব্যক্ত বাসনার সেই ছবি কাউকে দেখানো যায় না। বলাও যায় না।

প্রথম বসন্তের যে মধুর ছবিগুলো সুব্রতকে নিয়ে দেখেছিল সে সব যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন। সুব্রতর নিরুত্তাপ সান্নিধ্যের মধ্যে এখন শুধুই হতাশার ছবি। দিনের পর রাত তারপর আবার দিন সব যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। বৈচিত্র্যের ছন্দ নেই কোথাও।

আর ভাবতে পারছে না মানসী। রাঙ্গা মাসীমা বোধহয় একাই আটা মেখে সব করতে বসেছেন। ব্রজমোহনবাবুকে বলে চায়ের কাপ ডিস নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে মানসী। উনুন ধরানোও হয়ে গেছে দেখে একটু লজ্জাই পায়।

রাঙ্গা মাসীমা ওকে দেখেই বলেন. আমি আটা করছি, তুমি কি তরকারি হবে কেটে ফেল। সুব্রতর কি আজও ফিরতে দেরি হবে !

রাঙ্গা মাসীমার কথায় ঘাড় নেড়েই সায় দেয় মানসী। ভূপতি আর অনাদি তো রাত করেই ফেরে। শ্যামল উঠে বোধহয় বকুনির ভয়েই বেরিয়ে গেছে আবার। রান্না করতে করতে রাত এগিয়ে আসে। রাঙ্গা মাসীমা কিছু সাহায্য করে উপরে চলে গেছেন। ওরা কেউই ফেরে নি। রাত্রের সব কাজ গুছিয়ে ব্রজমোহনবাবুর খাবারটা ওঘরে দিয়ে আসে মানসী। তারপর রাঙ্গা মাসীমাকে বলে অবসন্ন দেহটাকে কোনও রকমে টেনে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসে।

বিছানায় বসতেই চোখ গিয়ে পড়ে টেবিলে রাখা ওর আর সুব্রতর ছবিটার দিকে। বিয়ের পরই স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিল। ফটোটার ওপর ধুলোর একটা পাতলা আবরণ পড়েছে। অথচ প্রতিদিনই তো সকালে উঠে ফটোটা মুছে রাখে মানসী। আজই বোধহয় ভুল হয়ে গেছে।

টেবিল থেকে ফটোটা নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় মানসী। দু'চোখের পাতাও কেন যেন আপনা থেকেই ভারি হয়ে উঠেছে। চোখের জল মুছে আবার ফটোটা ঠিক করে মুছে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে অনেকদিন পরে ছোট্ট মেয়ের মত কাঁদতে থাকে মানসী।

আজ রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। তবুও খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে মানসী। কাল রাত প্রায় সাড়ে দশটায় এসেছে সুব্রত। ভূপতি অনাদি এমন কি শ্যামল পর্যন্ত খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। সুব্রতর সঙ্গে অনেকটা ইচ্ছে করেই কাল একটা কথাও বলে নি মানসী। সুব্রত অবিশ্যি রাত্রে শুয়ে কয়েকবার মানসীকে কিছু বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানসীর সেই পাশ ফিরে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকা শরীর থেকে কোনও সাড়াই আসে নি। কিছুক্ষণ মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে শেষে সুব্রতও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে চায়ের আসরে রাঙ্গা মাসীমা সুব্রতকে আজ বেশ কড়া সুরেই বললেন, তোর এই এত পরিশ্রমের দরকারটা কি বাপু। সারাদিন এত বড় বাড়িতে বউমা একলা থাকে : অফিস ছুটির পর আর কাজ না করে সোজা বাড়িতে ফিরতে পারিস না।

সুব্রত রাঙ্গা মাসীমার দিকে তাকিয়ে হেসে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই তিনিই আবার বলেন, আমি বলছি সুবি, তুই এসব কাজ ছেড়ে দে। তোদের চার ভাইয়ের যা রোজগার ভালই তো চলে যায় আমাদের। আর টাকায় দরকার কি ?

মার কথা শেষ হতেই ভূপতি বলে ওঠে, তবেই হয়েছে মা। ফুলদাকে আর সব কথা বলো শুনবে, শুধু ওই পয়সা রোজগারের পথ বন্ধের কথা বলো না। তাছাড়া কে জানে হয়ত এ চাকরিটা ছেড়ে শেষে ফুলদা ওই পার্ট-টাইমটাই ফুলটাইম করে নেবে ।

আহ্ কি হচ্ছে ভূপতি। মানসীর দিকে আড়চোখে দেখে ভূপতিকে ধমক দেয় সুব্রত। রাঙ্গামাকে বলে উঠে ঘরে এসে দাড়ি কামাতে বসে। বাজারের থলি নিয়ে চলে যায়। অনাদি ছুটির দিনে বাজার করার দায়িত্বটুকু অনাদি নিজেই নিয়েছে। কারণ স্থানীয় বাজার কমিটিরও সে পাণ্ডা। জিনিসপত্রের দাম নিয়ে কোনও কালোবাজারী হচ্ছে কি-না সেটা দেখাও সপ্তাহের শেষে একটা কর্তব্য। রাঙ্গা মাসীমা আজ শ্যামলকে বেশ জব্দ করেছেন। অনেকদিন থেকেই বলছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা। কিছুতেই হয়ে ওঠে না। কাল রাত্রেই একবার বলেছিলেন আজ সকালে উঠেই শ্যামলকে তাড়া দিয়েছেন। কোনও কাজের অজুহাতই খাটে নি। তাছাড়া সুব্রত রয়েছে বাড়িতে। ব্রজমোহনবাবু অবশ্যি একটু আপত্তি জানিয়েছিলেন কিন্তু রাঙ্গা মাসীমার যুক্তির কাছে সে আপত্তি থাকেনি। সদর রাস্তা থেকে একেবারে টানা ট্যাক্সি করেই যাবেন। তাই অসুবিধেও কিছু হবে না। বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত চেনা রিকশা রয়েছে।

গরদের লালপাড় শাড়ি পরে বাইরে এলেন রাঙ্গামা। মানসী আর শ্যামল ব্রজমোহনবাবুকে ধরে নিয়ে আসছে। সুব্রতকে বলে ধীরে ধীরে বাইরে এলেন রাঙ্গা মাসীমা। ঠাকুরকে প্রণাম করে রিক্শায় উঠে বসলেন। যাবার সময় মানসীর দিকে একটা ঘুষি পাকিয়ে মুখভার করে রিকশায় বসল শ্যামল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি সামলালো মানসী। সদর দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

অনাদির বাজার নিয়ে আসতে বেশ দেরি হবে। একা একা এভাবে চুপ করে থাকতে ভালও লাগছে না। কাজের তাড়াও কিছু নেই। পায়ে পায়ে ভূপতির ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় মানসী। ভূপতি কি যেন লিখছিল। ওকে দেখে লেখা বন্ধ করে বলে, আজও মুখটা ভার ভার লাগছে কেন বৌঠান?

না তো! চেয়ারে বসে বসে হাল্কাভাবেই জবাব দেয়। ভূপতি বালিশটা কোলের কাছে নিয়ে বসে বলে, না বললে শুনবো কেন? তোমার মুখের রেখায় আঁকা রয়েছে গম্ভীর ভাব।

তুমি কি আজকাল জ্যোতিষী চর্চাও করছো নাকি? মানসীর এ কথায় জোরে হেসে ওঠে ভূপতি, তা যা বলেছ, ইদানিং ওই ব্যাপারে একটু মনোযোগ দিতে হয়েছে। কারণ আইবুড়ো নাম ঘোচাতে হলে ওটা একান্ত দরকার। তাছাড়া মেয়েদের হাত দেখতে পাওয়াও একটা লাভ। ছোঁওয়া লেগে যদি কিছু ঘটে যায়।

ভূপতির কথায় মানসীও হেসে ফেলে। হাসি থামলে বলে, মেয়েদের শুধু হাতের ছোঁওয়া কেন, হৃদয়ের পরশও গ্রহণ কর না—কে বারণ করেছে। আর তাতে যদি কেউ ঘরে আসে আমি তবে বেঁচে যাই। মানসীর কথার সুর অন্যদিকে যাচ্ছে বুঝেই ভূপতি অবাক হয়ে বলে, মানে, কি বলতে চাইছো বৌঠান!

মানে সহজ—তোমাকে জব্দ করার একজন দোসর ঘরে এলে আমার সুবিধে হয় এই আর কি! কথাটা বলে অন্যদিকে তাকায় মানসী।

ভূপতি একটু এগিয়ে এসে বলে, দোহাই বাবা আমাকে নিয়ে আর টানাটানি করো না। তুমি একাই ফুলদাকে যা দেখাচ্ছ আর দোসরে কাজ নেই।

ভূপতির কথায় মানসী ওর মুখের দিকে তাকাতেই ও আবার বলে, আচ্ছা বৌঠান, আমি বিয়ে করলে তুমি সত্যিই খুশী হবে।

আহা শুধু আমার খুশী হওয়াটাই যেন বড় কথা। কেন, তোমার ইচ্ছে হয় না সংসারী হতে!

হয়েছি তো—রেগুলার চাকরি করে সংসারে টাকা দিচ্ছি।

সেটাকে সংসারী হওয়া বলে না। বাবা-মার একটা সাধ-আহ্লাদ নেই?

তা হলে কি নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়ে সং সেজে জোয়াল কাঁধে নিতে হবে। মায়ের সাধ তো বাধ্য ছেলের মত ফুলদাই পূরণ করেছেন। না বৌঠান' আমাকে আর ওরকম সং সাজতে বলো না। তাছাড়া শুধু শুধু রং-বেরংয়ের শোলার টুপি মাথায় এঁটে অচেনা একটা মুখকে কাছে টানার মানেই বা কি? তার চেয়ে এই বেশ আছি।

তা তো থাকবেই। সংসারের কোনও ঝক্কি তো আর সামলাতে হচ্ছে না। যত কিছু দায় সব তো ফুলদা আর—

বৌ-ঠা-ন। মানসীর কথার মাঝখানেই জোরে চিৎকার করে ওঠে ভূপতি।

লজ্জায় ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে মানসী। কথাটা ঠিক এভাবে বলতে চায় নি ও—কিন্তু তবুও বলা হয়ে গেল। এখন তো আর কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অথচ কিভাবে যে এমন একটা রূঢ় সত্যি কথা ভূপতিকে বলে বসল মানসী। ভূপতির মুখের দিকে তাকাবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ও। অজানা একটা ভয় যেন গ্রাস করতে চাইছে সমস্ত দেহমন। অবাক বিস্ময়ে ভূপতিও তাকিয়ে আছে মানসীর মুখের দিকে। কোনও কথাই আর ওর মুখে যোগাচ্ছে না। একটা চরম অস্বস্তিকর অবস্থা। মাথা নীচু করেই নিজেকে কিছুটা সংযত করে মানসী। তারপর বলে, তুমি কিছু মনে করো না ঠাকুরপো। আমার আজকাল সত্যিই যেন কি হয়েছে। কোনও কথাই ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারি না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ভাই।

কথাগুলো বলেই আর ঘরে দাঁড়ায় না মানসী। দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সমস্ত শরীরটা যেন ঘুরছে। কিছুই ভাল লাগছে না। সুব্রতর কাছেও এখন এভাবে যাওয়া যায় না। হয়ত রাগের মাথায় তাকেও কিছু বলে বসতে পারে। কিন্তু তা হলেও মনের এরকম পরিস্থিতিতে সুব্রতর মুখটাই সামনে ভেসে উঠল। আনমনা ভাবেই ঘরে ঢুকলো মানসী। দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। শেভিং সেট

গুছিয়ে রেখে সুব্রত কি যেন খুঁজছে। মানসী ঘরে ঢুকতেই একটু বিরক্ত ভাব নিয়েই বলল, কখন থেকে চাবি খুঁজছি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কেন চাবি কি হবে। সুব্রতর সামনে দাঁড়িয়ে বলে মানসী।

সুব্রত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, জামা বের করবো—বেরতে হবে।

আজ আবার কোথায় বেরবে? অবাক হয়েই প্রশ্ন করে মানসী।

সুব্রত ওর দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বলে, কাজ আছে একটু।

আজ তো ছুটি। ছুটির দিনে কোনও অফিস খোলা থাকে না।

যা বোঝ না, তা নিয়ে তর্ক করো না। অফিস ছাড়াও তো বাইরের কাজ থাকতে পারে।

হ্যাঁ সে তো থাকবেই। প্রতিটি ছুটির দিনই দেখছি, আজকাল তোমার বাইরে কাজ থাকছে। তুমি কি মনে কর আমি কিছুই বুঝি না।

কি বোঝ তুমি? সুব্রত এবারে গলায় জোর দিয়ে বলে। সুব্রতর মেজাজ দেখে মানসীও অবাক হয়ে যায়। যে মানুষ কিছুদিন আগেও কত আপনার ছিল। সেই একই মানুষ কত বদলে গেছে। মানসীর প্রতিটি কথার জবাব কেমন রূঢ়ভাবে আজকাল দেয় সুব্রত। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কেমন কৌশলে এড়িয়ে যায়। অথচ আগে ছুটির দিনে বাড়ি থেকে কোথাও বেরত না। সবই বুঝতে পারে মানসী। সুব্রতর এই চড়াসুরে কথা শুনে মানসীর রাগ বেড়ে যায়। এমনিতেই ভূপতির সঙ্গে অমন একটা কথা বলার ফলে মনটা ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তারপর সুব্রতর এই অসংযত ব্যবহার! নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না মানসী। সুব্রতর দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে গলার স্বর তীব্র করে ও এবারে বলে, সব বুঝি। এখন আমার উপস্থিতিও তোমার অসহ্য লাগছে। তুমি কি মনে কর আমি কচিখুকী। কেন তুমি প্রতিদিন রাত করে বাড়ি ফের। অফিসের পর পার্টটাইমের কাজের নাম করে কোথায় তুমি যাও। সে সব কিছু আমি জানি। শুধু তোমার অসম্মান হবে বলে এতদিন এ কথা আমি বলি নি। কিন্তু—এখন—।

বলবে, এই তো। মানসীর কথা কেড়ে নিয়ে বলে সুব্রত।

সেই একই সুরে মানসী আবার বলে, হ্যাঁ শুধু বলবো নয়, তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার আমার।

তোমার থাকতে পারে' আমার নেই। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এ রকম জঘন্য কথার বোঝাপড়া নিয়ে নয়। নিজেকে তুমি ধীরে ধীরে কোথায় নামিয়ে এনেছ সেইটুকু আগে নিজে বোঝ! তারপর কথা।

আমি না তুমি? তোমার প্রতিটি কথার মানেই আমি বুঝি। কথাটা বলেই

একটু সরে দাঁড়ায় মানসী। তারপর বলে, তুমি অস্বীকার করতে পার পার্ট-টাইমের যে অফিসে তুমি যাও, সেখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার চেনা-জানা নেই।

মানসীর কথা শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে যায় সুব্রত। তারপর মনের সেই ভাব চেপে অনেকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, কলকাতা শহরের অনেক মেয়ের সঙ্গেই পরিচয় আছে আমার। এটা কিছু নতুন কথা নয়। একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই চরিত্র নষ্ট হয় না। তোমার মত নীচ মনের মেয়েরাই এসব কথা চিন্তা করে। আর নিজেরা কষ্ট পেয়ে অন্যকেও সেই কষ্টের অংশীদার করতে চায়।

বাঃ—সুন্দর কথা। ঠিক সিনেমার নায়কের মত মুখস্থ অভিনয়। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ, অবিবাহিতা একটি মেয়ের হাত ধরে গড়ের মাঠে রাত্রিবেলায় কি অফিস করতে যায় সেটা জানাও কি নীচ মনের পরিচয়! আবার সুব্রতর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় মানসী।

সুব্রত চিৎকার করে বলে ওঠে, কে বলেছে তোমাকে এসব কথা!

এতক্ষণে বিদ্রূপের সুরে জবাব দেয় মানসী, কেন—খুব লেগেছে নাকি সাধুবাবার মনে?

ওদের দুজনার কথার শব্দেই ভূপতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুব্রতর ঘরের দরজার বাইরেই থেমে গিয়েছিল। মানসী আর সুব্রতর শেষের কথাগুলো কানে আসতেই ভয় পেল ভূপতি। কারণ মানসীর অভিযোগের কথাগুলো সবই সত্যি। ভূপতিই একদিন মানসীকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ওই ধরনের কিছু কথা শুনিয়েছিল। হয়ত সুব্রতর ওই রূপটা ভূপতির চোখে খারাপ লেগেছিল। হঠাৎ একদিন সুব্রতকে একটি অচেনা মেয়ের পাশে, কলকাতার রাস্তায় অন্তরঙ্গ হয়ে চলা দেখে নিজের চোখ দুটোকেই প্রথমে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু পরে খবর নিয়ে জেনেছে ভূপতি, সুব্রত নাকি আজকাল প্রায়ই ওই মেয়েটিকে নিয়ে বেরোয়। মেয়েটি সুব্রত যে পার্ট-টাইমের অফিসে কাজ করে সেখানকার।

তবে এসব নিয়ে সুব্রতকে কিছু বলতেও সাহস পায় নি ভূপতি। তবে ফুলদাকে ভালবেসেই হোক আর মানসীর কথা চিন্তা করেই হোক এর যে একটা খারাপ দিক থাকতে পারে, আর সেটা সুব্রত আর মানসী দুজনার পক্ষেই ভীষণ ক্ষতিকর সেইটুকু চিন্তা করে অনেক হাসির কথার সঙ্গে মানসীকেই একদিন সুব্রতর এই রূপটার কথা বলেছিল ভূপতি। কথাটা বলেই আবার সাবধানও করেছিল মানসীকে। সে যেন অন্যায়ভাবে সব না জেনে সুব্রতকে আঘাত না করে। ভূপতিই অন্য কিছু হলে জানাবে মানসীকে। কিন্তু ভূপতির সেই নিষেধ না শুনে আজই যে মানসী এমনভাবে সুব্রতকে সব বলবে এ কথা ভূপতি চিন্তায় আনে নি। এবার হয়ত মানসী আরও অনেক কিছুই বলবে। ওর অন্তরের

ব্যথা ভূপতিও বোঝে। কিন্তু সে ব্যথা সমাধানের উপায় কিছু নেই। এভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাও শোভন নয়। কেউ হঠাৎ এসেও পড়তে পারে আবার ওদের কারও সঙ্গে চোখাচোখিও হয়ে যেতে পারে। তাই ধীরে ধীরে আবার নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় ভূপতি।

মানসীর ওই রকম তাচ্ছিল্যের সুরে কথা শুনে সুব্রত তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। মাথার সমস্ত শিরাগুলো দপদপ করছে। কান দুটোও গরম হয়ে উঠেছে। হয়ত একটা চরম অপ্রীতিকর অবস্থারই সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই অনেক কষ্টে নিজেকে কিছুটা সংযত করে সুব্রত বলে, তোমার এসব নোংরা কথার জবাব দেবার মত সময় আমার নেই। পথ ছাড়।

সুব্রতর কথা শুনে এবারে হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মানসী সুব্রতর বুকে। দুই হাতে জামাটা মুচড়ে ধরে বলে, কোথাও বেরতে পারবে না তুমি এখন। আজ তোমাকে কিছুতেই বাইরে যেতে দেব না আমি—কিছুতেই না।

কথাগুলো শেষ করে হাঁফাতে থাকে মানসী। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় এখুনি পড়ে যাবে। কোনও কিছু চিন্তা করার মত মনও নেই আর। সুব্রতরও জেদ চেপে গেছে। হাত দিয়েই জোরে মানসীর হাত ছাড়িয়ে পুরনো জামা গায়ে দিয়েই বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুব্রত।

অবরুদ্ধ কান্নার বেগ আর চেপে রাখতে পারে না মানসী। থরথর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত দেহ। মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল। কোনও রকমে হাত দিয়ে টেবিলের পাশটা ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর টলতে টলতেই বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। বালিশটা জোরে বুকের কাছে চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে মানসী।

রাঙ্গা মাসীমা বলেই গেছেন বিকেলের দিকে ফিরবেন। দক্ষিণেশ্বরে ব্রজমোহনবাবুর এক বন্ধুর বাড়ি। অনেকদিন সেখানে যেতে বলেছেন তা নানান ঝামেলায় কিছুতেই আর যাওয়া হয় না। তাই আজ সেইখানে যাবার কথাই বললেন রাঙ্গামা। অনেকদিন পরে পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হলে মনটাও ভাল হবে মেসোমশাইর। দিন-রাত শুধু ঘরে শুয়ে বসে থাকতে দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বুড়িয়ে গেছে। সব সময় শুধু খুনসুটি লেগেই আছে। তাছাড়া অসুখের চিন্তা তো আছেই। রাঙ্গা মাসীমারা সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে ফিরবেন।

কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে বিছানায় ভাল করে বসে মানসী। কিছুই ভাল লাগছে না এখন। ভূপতি কি আছে? কিন্তু এখন আবার কোন মুখেই বা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। এলোপাথাড়ি চিন্তার স্রোতের মধ্যেই দরজার সামনে হঠাৎই ভূপতিকে দেখতে পায় মানসী। ওকে দেখেও মাথা নীচু করে

বসেই রইল। পায়ে পায়ে ভূপতি এসে বসল চেয়ারে। খবরের কাগজটা দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, তোমার ব্যথা আমি বুঝি, বৌঠান। সবই বুঝি। কিন্তু সে ব্যথা সারানোর ওষুধ তো আমার জানা নেই।

মানসী চুপ করেই থাকে। ভূপতি আবার বলে, রান্না করবে না। আমার একটু বাইরে যাবার দরকার ছিল। ভেবেছিলাম সকাল করে খাওয়া সেরেই বেরব।

সেজো ঠাকুরপো বাজারে গেছে। নির্লিপ্ত কণ্ঠে এবারে জবাব দেয় মানসী।

ভূপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তাহলে থাক, এখন আর আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আমি না হয় ঘুরে এসেই খাব।

কোথায় কাজ তোমার ?

কলকাতায়ই যাব। একজন পাবলিশারের বাড়িতে। ওই একটা কবিতা সংকলন যদি বলে-কয়ে আর কিছু টাকা দক্ষিণা দিয়ে বের করা যায় সেই প্রচেষ্টার তদবির করা আর কি ?

তাহলে তো বেশ দেরি হবে ফিরতে ?

হ্যাঁ সে তো একটু হবেই।

তোমরা সবাই কি ইচ্ছে করে বেছে বেছে ছুটির দিন গুলোতেই বাইরের কাজ যোগাড় কর।

মানসীর এবারের কথায় হেসে ফেলে ভূপতি। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে বলে—এতক্ষণ বেশ গ্র্যান্ড কর্ড দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলে হঠাৎই লুপে ছিটকে এলে কেন বল তো ? আমার তো চালচুলো নেই। তাই ছুটির দিনের বিশেষ কোনও ব্যঞ্জনাও নেই।

নেই বলেই তো পার পেয়ে যাচ্ছ। মানসীর কণ্ঠস্বর আবার ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে।

ভূপতি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—ছেড়ে দাও ওসব। আমার কথা সবই তো তুমি জান। তবে তুমি কিন্তু আজ একটা ছেলেমানুষী করে ফেললে।

কি ? শঙ্কিত চোখে মানসী তাকায় ভূপতির দিকে।

ভূপতি কিন্তু হেসেই বলে—ফুলদাকে আজই এভাবে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হলো না। হয়ত ব্যাপারটা তুমি আমি যা ভেবেছি মোটেই সেরকম নয়।

থাক তোমার আর ফুলদার হয়ে ওকালতি করতে হবে না। তোমাদের সবাইকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি।

তবে তো ভালই। এখন তাহলে নিজেকে চিনে একটু সোজাভাবে তাকাতে চেষ্টা কর।

তার মানে ?

এই দেখ, আবার রেগে যাচ্ছ। না বাবা, শুধু শুধু আমাকে নিয়ে আর তোমার বুকের কষ্ট বাড়াতে হবে না। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন বৌঠান,

আমাদের সম্পর্কটাই হাসি-ঠাট্টার। তাই এরকম দু-একটা কথায় সব সময় মানে খুঁজতে যেও না। এইটুকু বলে একটু চুপ করে ভূপতি। তারপর বলে—আমার ফিরতে কিন্তু সত্যিই দেরি হবে। আমার জন্যে বসে না থেকে খাওয়া মিটিয়ে নিও।

কথাগুলো বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ভূপতি। মানসী বেশ বুঝতে পারে ভূপতি ওকে অন্য কিছু বলতেই এসেছিল। কিন্তু সে কথা না বলেই চলে গেল। হয়ত ভূপতিও আজ বাড়িতে খাবে না। অনাদির এখনও বাজার শেষ হয় নি। বাজারে গেলেই যত লোকের দৈনন্দিন সমস্যার কথা সব নাকি অনাদির কাছে বলে সবাই। আর সেও অসীম ধৈর্য নিয়ে সেই সব লোকের সুখ-দুঃখের কথা শুনে সমাধানের চেষ্টা করে। এসব নাকি প্রাথমিক কাজ। মানে বড় ধরনের দেশের কাজ করতে গেলে, এই রকম সব স্থানীয় লোকদের সুখ-দুঃখ দিয়েই জীবনে শুরু করতে হয়। অনাদির সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেই প্রথমে কিছুক্ষণ ও শুনবে। তারপর রাজনীতি ছাড়া শুধু ঘরকন্নার কথা হচ্ছে বুঝলেই ও হয় সেখান থেকে চলে যাবে না হয় নিজেই লাইন করে রাজনীতিতে টেনে নিয়ে যাবে। অনাদির কথা মনে আসতেই এতক্ষণ পরে হাসি পেল মানসীর।

ফাঁকা বাড়িতে একা একা ভালও লাগছে না। তবুও উঠতে ইচ্ছে করছে না। একলা ঘরে শুয়ে আবার নিজের বিবাহিত জীবনের ফেলে-আসা দিনের ছবিগুলো মনের আয়নাতে দেখতে থাকে মানসী। এখনও ভাবলেই মনে হয়—এই তো সেদিনের কথা। কোনও কিছুই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় নি।

কত আনন্দ আর উত্তেজনার মধ্যেই না কেটেছে বিয়ের প্রথম কয়েকটা বছর। মানসী যেন চোখে হারাত তখন। অফিস যাবার সময় আর বিকেলে বাসায় ফিরলে মানসীর উপস্থিতি চাই-ই। এমন কি রাঙা মাসীমাও বলে দিয়েছিলেন, সুবি একটু আগোছালো আর খেয়ালী। ও যা বলে ঠিকমত শুনে ওর মন যুগিয়ে চলো কিন্তু বউমা। এমনিতে খুব লক্ষ্মী কিন্তু রেগে গেলে একেবারে বাপের কু-পুত্তুর।

এটা ঠিকই বলেছিলেন রাঙামা। ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় মান অভিমানও লেগেই থাকত। হয়ত অফিসে যাবার সময় জলের গ্লাস নিয়ে যেতে একটু দেরী হয়েছে মানসীর। অমনি কি রাগ সুব্রতর। জল না খেয়েই বেরিয়ে যেত। মানসী প্রথম প্রথম নিজেও রাগ করত। কিন্তু পরে অবুঝ সুব্রতর রাগ করার মানে বুঝে নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। অফিস থেকে ফিরে মানসীকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুলত সুব্রত। সুব্রতর বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে মানসীও যেন অন্য এক জগতের মধ্যে চলে যেত। তারপর কিছু সময় সেই সুখের সাগরে ভেলা ভাসিয়ে মানসীই আগে বাস্তবে

ফিরে আসত। এক রকম জোর করেই নিজেকে সুব্রতর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলত, এবার ছাড়, অনেক তো হল। আর যেটুকু বাকি আছে রাত্রির জন্য তোলা থাক। মানসীর কথায় সুব্রত আবার এগিয়ে আসত। তারপর কোনও কথা না শুনে আর একবার মানসীর দুই ঠোঁটে এঁকে দিত স্নেহচুম্বন। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছে মানসী বলত, অসভ্য! তোমার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। সুব্রত ওর হাত ধরে বলত—নিজের বিয়ে করা বউয়ের সঙ্গে ভালবাসার খেলা খেললাম, তাতে অসভ্যতার কি হলো?

জানি না, যাও।

তাহলে বলো—অফিসে বেরনোর সময় আর কোনওদিন দেরি করে আমার কাছে আসবে না।

কি করবে তাহলে?

এই রকম অসভ্যতা অফিস থেকে ফিরেই আরও বেশী করে করবো। মানসীর দুষ্টুমিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেই জবাব দিত সুব্রত।

এই সব টুকরো টুকরো কত ছবি। তবে সবচেয়ে মজা হয়েছিল, বিয়ের পর এক বছর পার হলে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে যেতে। ভূপতি-অনাদিরা বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। কিন্তু সুব্রত কেমন কৌশলে রাঙ্গা মাসীমাকে বলে ওদের যাওয়া বন্ধ করেছিল। সে সব ঘটনা এখন যেন সত্যিই স্বপ্নের মত মনে হয়। তবুও ভাবতে ভাল লাগে। এখনকার এই জীবনে, ভাল লাগার মত শুধু ওই ফেলে আসা দিনের স্মৃতিগুলোই শুধু পড়ে আছে। টুকরো টুকরো সেই সব স্মৃতির ছবিগুলো পর পর সাজালে অশান্ত মনটা বেশ কিছু সান্ত্বনা পায়।

বেশ মনে আছে, হঠাৎ মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথা বলে সুব্রত কেমন চমক লাগিয়েছিল মানসীর মনে। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিনের মত সেদিন মানসীর সঙ্গে প্রথম একটাও কথা বলে নি। জামা প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মানসী একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। কি জানি অসুখ টসুখ করলো নাকি! কাছে গিয়ে বসে কপালে হাত রাখতেই একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিল সুব্রত। বেশ কিছুক্ষণ আদরের পর মানসীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—ভয় পেয়েছিলে, না?

মানসী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই উঠে বসে সুব্রত। তারপর অনেকটা মুখস্থ বলার মত বলে যায়— সব জিনিস-পত্তর ঠিকমত গুছিয়ে নাও। হাতে একদম সময় নেই। মাঝে আর মাত্র দুটি দিন। এর মধ্যেই সব কেনা-কাটা করে নিতে হবে। তাছাড়া তোমাকে সামলানোর দায়িত্বও রয়েছে। একা একা কি করে যে সব ম্যানেজ করব আমি তো কিছুই বুঝছি না। তবে তুমি সঙ্গে যাচ্ছ, এই যা ভরসা। না হলে কার দায় পড়েছিল—এই সব হাঙ্গামায় নিজেকে জড়াতে।

নেহাৎ তুমি কানের কাছে প্রতিদিনই গুন গুন কর, তাই সব ঠিক করেই ফেললাম। তাছাড়া—

এই, কি হলো কি, তোমার? কি সব আবোল তাবোল বকছো? মাথামুণ্ডু নেই—একভাবে শুধু বকেই যাচ্ছ। কি হয়েছে, বলবে তো? সুব্রতর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে মানসী।

ওর দিকে তাকিয়ে হেসে আবার বলে সুব্রত—তা ছাড়া, আমার তো ওসব জায়গা ঘোরাই ছিল। শুধু তোমার কথা ভেবেই সব কিছু ঠিক করলাম।

কি ঠিক করেছ বলবে তো?

হনিমুন!

মানে—?

মানে—হনিমুন। বিয়ের পর বউ নিয়ে প্রথম বাইরে বেড়াতে যাওয়া। এবারে বুঝলে ম্যাডাম?

সত্যি?

সত্যি-সত্যি-সত্যি, একেবারে তিন সত্যি। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। আর জায়গাটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ। খাস নবাবের জায়গা। সেখানে যাব শুধু তুমি আর আমি। তারপর—

এই—এই—খবরদার বলছি। আর এগোবে না। এবার যদি অসভ্যতা শুরু কর, তবে আমি কথা না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব বলছি। সুব্রত আবার এগিয়ে এসে মানসীর হাত ধরতেই ও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসে বলে। সুব্রতও হাসতে হাসতে নিচে নামে। তারপর অন্য সুরে বলে—রাঙামামাকে বলে রাজি করানোর ভারটা কিন্তু তোমার।

ওরে বাবা! আমি তাহলে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে নেই। বেশ লোক তো তুমি। এসব কথা কি আমার বলা চলে?

কেন বললে দোষের কী? তুমি বললে রাঙামা কিছুতেই না করতে পারবে না।

সে তুমি বললেও না করবেন না।

বেশ, তা হলে আমিই বলবো। কিন্তু তার জন্যে উপরি পাওনা কিছু চাই কিন্তু। রাজি তো?

জানি না—যাও।

মনের মধ্যে একটা অফুরন্ত খুশীর রেশ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মানসী। অনেকদিন পরে গুন গুন করে গান গায়। সুব্রতর কাছ থেকে বাইরে যাবার কথাটা শোনার পর থেকেই সব কিছু যেন আবার নতুন করে ভাল লাগছে।

সুব্রতই সবাইকে বলল। রাঙা মাসীমা প্রথমে একটু আপত্তির ভাব জানালেও পরে সুব্রতর কথায় আর না করতে পারলেন না। ভূপতি অনাদিও বুঝিয়ে বলল।

তবে ওরাও যেতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু সুব্রতই ওদের আবার পরে একবার নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় ভূপতি, আর কোনও কথা বলেনি।

সুব্রতর অফিসের এক বন্ধুর বাড়ি আছে মুর্শিদাবাদে। তবে সেখানে কেউ-ই থাকে না। এক বুড়ো মালী শুধু বাগান আর বাড়ি দেখাশোনা করে। বছরে একবার শীতের সময় শুধু তারা এক মাস সেখানে থাকে। সেই বন্ধুর কাছে অভয় পেয়েই পাঁচ দিনের পাড়ি জমাতে প্ল্যান করেছে সুব্রত। সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আনন্দের ফলে কেঁদেই ফেলেছিল মানসী।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। যাবার আগের দিন রাত্রে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল মানসী। ভোর চারটেয় উঠে সব গোছগাছ করে নিতে হবে। সকাল আটটা দশে ট্রেন। রাঙ্গা মাসীমা রাত্রেই প্রায় সব গুছিয়ে দিয়েছিলেন। বার বার সব জিনিস মানসীকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সব সময় চাবির গোছা নিজের কাছে রাখবে। একা একা বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, কার মনে কি আছে বলা যায়? রাঙ্গা মাসীমার সমস্ত কথা বাধ্য মেয়ের মত চুপ করে শুনে যাচ্ছিল মানসী।

পরদিন ঠিক সময়ে উঠে দাড়ি কামানো শেষ করেই চিৎকার শুরু করল সুব্রত। তখন সবে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। সব কিছুতেই তাড়া দেবে লোকটা। মাঝে মাঝে সুব্রতর কথায় রাগও হচ্ছিল। কিন্তু মনের আনন্দে সে রাগের প্রকাশ ছিল না মানসীর।

ভূপতি-অনাদিকে নিয়ে রাঙ্গা মাসীমাও স্টেশনে এলেন। আর একবার সুব্রতকে সাবধান করে বললেন—বউমাকে একলা বাড়িতে রেখে কোথাও যেন যাবি না সুবি। সব সময় দু'জনে একসঙ্গে থাকবি।

সে আর তোমাকে বলতে হবে না রাঙ্গামা। তোমার বউমা আমাকে একলা ছাড়লে তো। দেখছো না কেমন জোঁকের মত লেপ্টে রয়েছে এখনি। মানসী সুব্রতর খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই দেখেই এমন একটা মুখ-ফোঁড় কথা বলে যায় ও। লজ্জায় তাড়াতাড়ি রাঙ্গা মাসীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মানসী। ভূপতি একটা ওয়াটার বটল্ কিনে জল ভরে আনে। তাড়াতাড়িতে বাড়ি থেকে জল আনা হয় নি।

ট্রেন এসে দাঁড়াতেই হুড়োহুড়ি লেগে যায়। অনাদি দৌড়ে গিয়ে একটা কম্পার্টমেন্টের দরজায় হাত রাখে। ভূপতি সেদিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে জিনিসপত্তর উঠিয়ে মানসীকে গাড়িতে তুলে দেয় সুব্রত। রাঙ্গা মাসীমাও ওঠেন। গাড়ি ছাড়তে তো দেরি আছে। সব কিছু আবার ভাল করে গুণে বুঝিয়ে দেন মানসীকে। সুব্রত রাঙ্গা মাসীমাকে প্রণাম করে এবার ফিরে যেতে বলে। বাড়িতে শ্যামল আর মেসোমশাই রয়েছেন। গাড়ি ছাড়ার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে যায়। রাঙ্গা মাসীমা ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ান। মাথা নিচু

করে সাবধানে প্রণাম করে মানসী। রাঙ্গা মাসীমা ধরা গলায় আশীর্বাদ করেন—সাবধানে থেক মা—আর ভাল না লাগলে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

ভূপতির হাতের রুমাল নাড়া দেখতে দেখতে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে এতক্ষণে আয়েস করে বসে মানসী। কৃষ্ণনগর পর্যন্ত মেল হয়ে যাবে। মানসীদের কামরায় তেমন একটা ভিড় নেই। জায়গায় বসে সুব্রতর হাতে একটা জোরে চিমটি কেটে বলে মানসী—

চল না, মজা দেখাচ্ছি তোমাকে। আমি জোঁকের মত তোমার সঙ্গে লেপ্টে থাকি—না?

মানসীর কথায় হেসে সুব্রত সিগারেট ধরায়। পরিবেশের কথা চিন্তা করেই আর কিছু বলে না। কি জানি অবুঝ মেয়েটা যদি কেঁদেই ফেলে। দুই চোখে আনন্দের জোয়ার এনে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে মানসী। এলোপাথাড়ি হাওয়ায় মাথার চুলগুলো উড়তে থাকে। মানসীর সেই মুখ দেখে পরম তৃপ্তিতে একটা স্বপ্নের ছবি মনে আঁকতে থাকে সুব্রত।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার পেঁছুতে প্রায় বেলা তিনটে হয়ে গেল। কৃষ্ণনগরের পর লেট হয়ে চলার ফলেই এই বিপত্তি। যাই হোক মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে রওনা হল ওরা। মানসীর আরও মজা লেগেছিল সে সময়। ঘোড়ার গাড়িতে সেই প্রথম ওঠা। মাঝে মাঝে ঝাঁকি লেগে সুব্রতর গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সুব্রতর পাশে বসে রাস্তার দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব কথা বলছিল।

এই দেখ দেখ জেলখানার পাঁচিলটা কত উঁচু।

তিনটে ভাঙ্গা শিবমন্দিরের গায়েই আবার একটা মসজিদ। ওরে বাবা! কত বড় বড় হনুমান দেখছো?

আঃ, কি ছেলেমানুষী করছ! ওকে এক রকম ধমক দিয়েই থামিয়ে রাখছিল সুব্রত।

অবশেষে বাজারের রাস্তা পেরিয়ে ঠিকানা মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাসস্থানের দোরগোড়ায় পেঁছে গেল গাড়ি। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে আগে নামল মানসী। ভাড়া মিটিয়ে সুব্রতও মাল নিয়ে দাঁড়াল।

ওদের দেখেই বাড়ির কেয়ারটেকার বুড়ো লোকটা এগিয়ে এল। সামনে একটা চায়ের দোকান। সেখানেই বোধ হয় বসেছিল। পরিচয় দিতেই নমস্কার করে জিনিসপত্তরগুলো তুলে নিয়ে লোকটা ওদের ভিতরে নিয়ে চলল।

বেশ ছিমছাম বাড়ি। গঙ্গার একেবারে লাগোয়া, একটু নিরিবিলিও। ঘরে ঢুকেই মানসী গান ধরল। সুব্রত আবার ধমকের সুরে বলল—শুরু থেকে কি যে ছেলেমানুষী করছ বুঝতে পারছি না।

বেশ করছি। এখানে আমি যা খুশী করব, তুমি কিছু বলতে পারবে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ মশাই। রাঙামামা বলে দিয়েছেন—এ ক'টা দিন সব নিয়মের বাইরেই কাজ হবে।

মানসীর এ কথায় হেসে ফেলে সুব্রত। তারপর কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে বলে—তা হলে তো আমার ভীষণ মুশকিল হবে।

কেন ? বড় বড় চোখে সুব্রতর দিকে তাকায় মানসী।

সুব্রত গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার কখন কি মেজাজ হবে তা তো জানি না। তবে আমার যে এখন একটা ইচ্ছে হচ্ছে।—কথাটা বলেই মানসীকে জড়িয়ে ধরে সুব্রত।

ওর কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মানসী বলে—উঁহু বললাম তো। তোমার সব চাওয়া এখন আমার খুশী হওয়ার উপর নির্ভর করছে। তাই—

তবে রে—। ওকে ধরতে যেতেই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মানসী। সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

লোকটা ওদের মুখ হাত ধোওয়ার জল নিয়ে বারান্দায় রাখছে। কাজেই আপাততঃ মানসীকে নিয়ে মজা করার ব্যাপারটা মনে পুষে রেখে লোকটাকে কিছু পয়সা দিয়ে চা-বিস্কুট আনতে বলে।

হাসতে হাসতে আবার ঘরে ঢোকে মানসী। প্রথম দিন থেকেই এ রকম কত আদর, কত আনন্দে ভরা ছিল সেই ক'টা দিন। ট্রেনের ধকলের জন্যই সেদিন বিকেলে আর ওরা বেরুল না। ঘরে বসেই আগামী কাল থেকে শহর দেখার পরিকল্পনা করল। ঘুরে দেখার যে সব বিশিষ্ট জায়গা মুর্শিদাবাদে আছে তার খবর বুড়ো মালী সত্যচরণের কাছেই পাওয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠেই রওনা হল ওরা। একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ি সত্যচরণই ঠিক করে দিয়েছিল। নবাবী আমলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্তিগুলো দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল মানসী। পাঁচ দিনের থাকার কথাই ছিল। কিন্তু ওরা চারদিন ছিল।

বেশ মনে পড়ছে মানসীর, খোসবাগে নবাবদের কবরখানায় গিয়ে কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিল ওরা দু'জনে। নবাবী আমলের কীর্তির চাইতেও তাদের কবরগুলোই মানসীকে ব্যথাতুর করে তুলেছিল বেশী। সুব্রত একটা একটা করে কবরের আর তাদের অতীত কাহিনী বুঝিয়ে দিচ্ছিল। উদাস দৃষ্টিতে কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে মানসী দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। প্রতিটি কবরই যেন একটা করে ইতিহাস। সত্যিকারের ইতিহাস রচয়িতার কাছে হয়ত সব কবরের কাহিনী চমকপ্রদ নয়। কিন্তু তবুও তারা এখানে নিজেদের গণ্ডীতে এক-একটা কাহিনী সৃষ্টি করেই বেঁচে আছে। প্রতিদিন যারা এখানের মাটিতে পা দিয়ে এই সব কবরের কাহিনী

জানতে চাইবে, তাদের কাছে নিষ্ফল কামনার কথাগুলো ওরা হয়ত কবরের মধ্যে থেকেই বলবে। গাইড হজরত আলির কাছ থেকে শুনে, মানসীকে যখন বুঝিয়ে দিচ্ছিল সুব্রত, মানসী তখন সত্যি যেন সেই সব কাহিনীর মধ্যে নিজেকে এক করে দেখছিল।

এই, কি হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? আগে চল।

সুব্রতর হাতের ধাক্কায় বাস্তবে ফিরে এসেছিল মানসী। খোসবাগের কবরখা না থেকে বেরিয়ে সেদিন আর কিছু ভাল লাগল না। হাজারদুয়ারী দেখার কথা থাকলেও সেদিন বাড়ি ফিরে গেল ওরা।

পরদিন হাজারদুয়ারী প্যালেস। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে প্রথমে ভীষণ চমক গিয়েছিল মানসী। কি কাণ্ড রে বাবা! ঘরের মধ্যে ঘর —তারপর আবার ঘর। এর যেন শেষ নেই। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছবিগুলো। ভারী মজার সে ছবি। শিল্পীর তুলির টানে প্রতিটি শিশুর মুখ জীবন্ত, যেন কথা বলতে চাইছে। তার সবচেয়ে মজা—যেদিক থেকেই তাকাও, মনে হবে ছেলেমেয়েগুলো যেন তোমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের ছবিগুলোর চাইতেও মানসী ওই ছোট ছেলেমেয়েদের ছবিগুলোই বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। গাইড সব এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। অনেক লোকের ভিড়ের সঙ্গে সুব্রত যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, মানসীর লোভ তখনও ওই ছেলেমেয়েদের ছবিগুলোর দিকেই ঘিরে রয়েছে। মনের একটা গোপন কামনাই ওকে অনেকটা ইচ্ছে করে পিছিয়ে রেখেছিল।

লোকের ভিড় একটু সরে গেলেই হঠাৎই চারদিক দেখে নিয়ে মানসী ওই ছেলেমেয়েদের ছবির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর অবদমিত কান্নার বেগ সামনে পরম আগ্রহে ছবিগুলোর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কতক্ষণ ওইভাবে ছবিগুলোর মধ্যে হাত দিয়ে রেখেছিল মনে নেই। হঠাৎই সুব্রত ব্যস্তভাবে এসে ওর গায়ে হাত দিতেই চমকে বাস্তবে ফিরে এসেছিল মানসী।

সুব্রতর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতেই ও বলল, কি কাণ্ড করছ বল তো? আমি এদিকে ভয়ে সারা। এ কি তোমার কলকাতার বাড়ি? যে দুটো ঘরের এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে এলে। তোমার এই সব কাণ্ড নিয়ে সত্যি আর পারি না। নাও এস। সবাই কত এগিয়ে গেল। ওদিকের ঘরে আরও কত সুন্দর সুন্দর ছবি রয়েছে। মানসীর একটা হাত ধরে সামনে এগিয়ে যায় সুব্রত। কোনও কথা না বলে নীরবে সুব্রতর পিছনে পিছনে চলতে থাকে মানসী।

হাজারদুয়ারী প্যালেসের সব দেখে ধীরে ধীরে সবার সঙ্গে নিচে নেমে এল ওরা। এবার নবাবের অস্ত্রাগার দেখা। মানসীর মনে তখনও বাচ্চাদের ছবিগুলোই ভাসছে। একটা কথাও বলছে না সুব্রতর সঙ্গে। ওর এই হঠাৎ ভাব পরিবর্তন

দেখে সুব্রতরও রাগ হয়েছিল। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ না করে ও শুধু বলল—কি হল? দাঁড়ালে কেন? কামান আর ঢাল তরোয়াল দেখবে বলেছিলে, যাবে না অস্ত্রাগার দেখতে?

না—মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। তুমি যাও, আমি বরং এই মাঠটায় একটু বসি।

তাই হয় নাকি? তুমি যাবে না, আমি একা দেখব সব?

কেন? কি হয়েছে তাতে?

না। কিছুই হয় নি। থাক্, আমিও বসি। আর ঘুরতে ভালও লাগছে না।

মানসী বুঝল, ওর জন্যই সুব্রত অস্ত্রাগার দেখতে গেল না। কিন্তু সেটা বুঝেও ও সুব্রতকে আর কিছু বলল না। এক ঠোঙ্গা বাদাম কিনে মানসীকে নিয়ে প্যালেসের সামনের মাঠে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসল সুব্রত। মানসীর মন ভাল করতেই এখানে আসা। কিন্তু এখানে এসেও মাঝে মাঝেই কেমন উন্মনা হয়ে যাচ্ছে ও। সুব্রত সব বুঝেও মানসীকে ভোলাবার জন্যই অন্য কথা শুরু করে। গঙ্গার দৃশ্য দেখতে দেখতে মানসীর অশান্ত মনটাও শান্ত হয়ে আসে। দু'জনে গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের রাস্তার দিকেই এগিয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়িটাকে ভাড়া মিটিয়ে ওখানেই ছেড়ে দেয়।

পরদিন সকালে উঠে মানসীর মন সম্পূর্ণ সুস্থ। রাত্রে শুয়ে সুব্রতর স্নেহছায়ায় আর নিবিড় ভালবাসার স্পর্শে মানসী যেন নতুন এক জীবনের স্বাদ ফিরে পেয়েছে। ভোরবেলায় উঠে খাবার করে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে যায়।

মদনমোহনের মন্দির, কাঠবাগান—এসব দেখে ওরা গিয়েছিল কাটরা মসজিদ দেখতে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রসিদ্ধ কীর্তি এই কাটরা মসজিদ। জীর্ণ ভগ্নদশা এখন। যেখান থেকে প্রতিদিন আজান দেওয়া হত, সেই সু-উচ্চ মিনারে উঠতে খুব ভয় পেয়েছিল মানসী। ওদের সঙ্গে আরও অনেক মেয়ে পুরুষ ছেলেমেয়ে ছিল। অনেকে মোটরেও এসেছে। মিনারে উঠতে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল মানসী—

আমি যাব না—ওই ভাঙ্গা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলেই পড়ে যাব। আমি নিচে থাকছি, তুমি দেখে এস।

সব জায়গাতেই শুধু খামখেয়ালী করছ। কিছু ভয় নেই। দেখ না, কত ছোট ছেলেমেয়েরা উঠছে। তোমার সব তাতেই ভয়।

সুব্রতর কথায় কাজ হয়েছিল। সুব্রতর হাত ধরেই ধীরে ধীরে পা ফেলে উপরে উঠেছিল মানসী। অত উঁচুতে উঠে নিচে তাকাতেই মাথা ঘুরে উঠেছিল। আরও অনেকে উঠে হাততালি দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ চাতালে বসে হঠাৎই উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল মানসী।

সুব্রত বসেই ছিল। মিনারের ভাঙ্গা দেয়ালে অনেকে লাল ইঁটের টুকরো দিয়ে নাম লিখছিল। মানসীও ওদের এখানে আসাটা অক্ষয় করে রাখার জন্যই একটা ইঁটের টুকরো নিয়ে দেয়ালে নাম লিখতে লাগল। খড়ির লিখন বৃষ্টির জলেই মুছে যাবে, তবুও তো ক্ষণিকের স্মৃতি। ওদের পরে যারা আজ উঠবে—তারা তো দেখবে। তাই সুব্রতর সঙ্গে নিজের নাম বড় বড় করে লিখে বেশ কিছুক্ষণ সেই লেখার দিকে নিজেই তাকিয়ে থাকল মানসী।

মুর্শিদাবাদের সেই চারদিনের স্মৃতি জীবন থেকে সত্যি কোনও দিন ভুলতে পারবে না মানসী। পীর সাহেবের দরগায় মনে মনে একটা মানতও করেছিল। কিন্তু সেও তো কত বছর হয়ে গেল। এখনও শূন্যের খেলাতেই ভরে আছে মানসীর জীবন। আর জীবনের এই শূন্যতার জন্যই বোধ হয় ধীরে ধীরে সুব্রতর মন অন্য দিগন্তে পাড়ি জমাচ্ছে।

কিছুই আর ভাল লাগে না এখন। সব চেনা মুখই যেন অচেনা মনে হয়। অতীত স্মৃতি রোমন্থন বন্ধ রেখে উঠে বসল মানসী। ভূপতি না খেয়েই বেরিয়ে গেল। বেলা যা হয়েছে নিয়মমত অনাদির বাজার নিয়ে আসার সময়ও হয়ে এসেছে। সুব্রত যে কোথায় গেল! কখনই বা ফিরবে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না মানসী। ভূপতি আজ ওদের সব কথাই হয়ত বাইরে থেকে শুনেছে। ভাগ্যিস রাঙ্গা মাসীমা বাড়িতে নেই। তাহলে যে কি হত ভাবাই যায় না। ভূপতিদের সামনে সুব্রতর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে চায় না মানসী। কিন্তু হঠাৎই যে ওর মাথায় আগুন ধরে যায়। সুব্রতর সম্পর্কে এই সব কথাগুলো ভূপতিই তো বলেছিল মানসীকে। আজ রাত্রে ও ফিরলে, আবার নতুন করে সব জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রয়োজন হলে, ভূপতির সঙ্গে নিজে গিয়ে সব দেখে শুনে আসবে মানসী। আর সেজন্য সব রকমের পরিস্থিতির সামনে পড়তেও প্রস্তুত।

না—না—এ হয় না—কিছুতেই না। এভাবে শুধু জোড়াতালি দিয়ে আর চলা সম্ভব নয়। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক এই মিথ্যে পুতুলের সংসার-খেলা। সব কিছু দেখে শুনেই মুক্তি দিয়ে যাব তোমাকে।

মানসী যেন সুব্রতকে শোনাবার জন্যই কথাগুলো বলে ওঠে। ফাঁকা ঘরে ওর কথাগুলোই ফিরে আসে। মাথা নীচু করেই ভাবে মানসী, কোনও বিধি-নিষেধের গণ্ডিতেই আর নিজেকে জড়াবে না ও। সন্তান না হওয়া যদি অপরাধ হয় আর সুব্রতর মনের কামনা যদি তাই হয় তবে নিজেকে সুব্রতর কাছ থেকে সরিয়েই নেবে। মানসীর মন এখন অনেক স্মৃতিকে বুকে নিয়ে সাগরের অতলে ডুবে যেতে চাইছে। মুক্তোর সন্ধান সেখানে মিলবে কি-না কে জানে! তবুও যেতে হবে।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই ক্ষুব্ধ ভাবটা প্রশমিত হয়। নিঃসঙ্গতা কাটাতেই বাইরে আসে মানসী। রান্নার পাট চুকিয়েই স্নান সারতে হবে আজ।

বাইরের রাস্তায় অনাদির কথা শোনা যাচ্ছে। অনেক চিন্তার জাল তাই মন থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকেই এগিয়ে যায় মানসী।

মানসীর সঙ্গে ওরকম একটা ব্যবহার করে বাইরে বেরিয়ে সুব্রতর মনটাও ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ বাজারের রাস্তায় আনমনা ভাবে ঘুরে চায়ের দোকানে বসে হাল্কা কথার আসরে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল। বিজয়ী সংঘের ছেলেরা চায়ের দোকান গরম করে রেখেছে। ক্লাবের আসন্ন প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার নামকরা থিয়েটার দল আসবে না নামী শিল্পীদের নিয়ে সংগীত অনুষ্ঠান হবে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তাই। সুব্রত কিছুক্ষণ ওদের আলোচনা শুনে খবরের কাগজের পাতাতেই মন দিল। কিন্তু খবরের কাগজের সংবাদে মন বসছে না।

মানসীর একের পর এক অভিযোগের কথাগুলোই বার বার মনের মধ্যে আঘাত করছে। মানসীকে না জানিয়ে হয়ত অনেক কিছুই করে সুব্রত। কিন্তু তা বলে এভাবে চরিত্রকে ছোট করার মত যে বাজের কথাগুলো মানসী বলল সেটা ভয়ংকর মিথ্যে।

মানসী মা না হতে পারার ব্যথা সুব্রতর বুকেও কি অনুরণন তোলে না? আর সেটা হয় বলেই মানসীর জন্য ওর দুঃখ হয়। দুঃখের সাথে ভয়ও হয়। খেয়ালী অবুঝ মেয়েটা সব ভুল বুঝে হঠাৎ যদি কিছু করেই বসে। কিন্তু এতে সুব্রতর তো সত্যিই কোনও হাত নেই। এক একজনের জীবন ছন্দ এক একরকম ভাবে সাজানো থাকে। চেষ্টা তো সুব্রত কম করে নি। ভাগ্যের ওপর নিষ্ফল আক্রোশ করে ঘরে বসে জীবনকে শুধু ধিক্কার দেয় নি ও। আধুনিক চিকিৎসা প্রথার যে সব উপায় সুব্রতর সাধ্যের মধ্যে আছে, সে সবকিছুই করেছে সে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল তো গতবার পরীক্ষা করে স্পষ্টই বলে ছিলেন—

আমি সত্যি দুঃখিত সুব্রতবাবু। মিসেসের মা হওয়ার সাধ বোধ হয় আর পূর্ণ হবে না। তবে একেবারে নিরাশ না হয়ে আপনি কিন্তু আরও একবার ডাক্তার মুন্সীকে দেখাতে পারেন।

ডাক্তার ঘোষালের মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থেকে সুব্রত শুধু একটু হেসেছিল। কোনও কথাই মুখে যোগায় নি। আর তাছাড়া কথা আছেই বা কি! ডাক্তার ঘোষাল বললেন বটে। কিন্তু ডাক্তার মুন্সীর কাছ থেকেও যে একই কথার প্রতিধ্বনিই শোনা যাবে সেটা সুব্রতও এই ক'মাসে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছে।

নিজেকে মানসীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই বেশী করে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে সুব্রত। এমনিতেই রাঙা মাসীমার অনেক কথার আঘাত সহ্য করতে হয় মানসীকে। তাই সুব্রতর কাছ থেকে যাতে আবার কোনও আঘাত

ও না পায় সেইটুকুই এখন একান্ত কামনা ওর। তবুও মাঝে মাঝেই এমন সব ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হয় যার সত্যিই কোনও মানে হয় না।

পার্ট-টাইমের অফিসের যে মেয়েটির সংগে ভূপতি ওকে কয়েকবার কলকাতার রাস্তায় চলতে দেখেছে সে জবা। দূর থেকে ওদের দু'জনাকে একসংগে দেখেই একটা অশুভ চিন্তার ছবি মনে এ'কেছে ভূপতি। আর হয়ত মানসীকেও সেই ছবিটা বেশ চড়া রং করে দেখিয়েছে। অশান্ত অবুঝ মানসী ভূপতির কাছে সেই ছবির বর্ণনা শুনে—শুধু নিজেকেই নয় সুব্রতকেও ক্ষতবিক্ষত করেছে আজ কথার আঘাতে। আজ মানসীর শেষের কথাগুলো শুনে সুব্রত স্থিরবিশ্বাসে এসেছে যে ভূপতি ছাড়া আর কেউই এ কথা বলতে পারে না। অথচ ঘটনাটা কিছুই নয়। সুব্রত শুধু জবাকে সাময়িকভাবে একটু সাহায্য করছিল মাত্র।

পার্ট-টাইমের অফিসে স্টেনো-টাইপিষ্ট জবা ভাদুড়ী। বড়ভাই না থাকায় নিজেকেই হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের পর স্টেনো আর টাইপিং শিখে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষে পাড়ার এক উঠতি মাতব্বরের সহায়তায় এই কাজটা জোগাড় করে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। বাবা অতি বৃদ্ধ কর্মশক্তিহীন। এক সওদাগরী অফিসে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ছিলেন। অবসর নেবার দু'বছর আগেই হাঁফানিতে পঙ্গু করে ঘরে বসিয়েছে।

সাতটি ছোট ছোট ভাই বোন। মা কোনও রকমে ধু'কতে ধু'কতে সংসার সামলান। আরও অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীবিন্যাসের শেষ পর্যায়ে আসা বাঙ্গালী মেয়েদের মত জবার জীবনকাহিনীও একই সূত্রে গাঁথা। বৈচিত্র্য নেই কিছু। সুব্রতকে প্রথম দিন থেকেই বড় ভাইয়ের সম্মান দিয়েছে জবা। মেয়েটির সহজ সরল মিষ্ট ব্যবহার সুব্রতরও ভাল লেগেছিল। মাসখানেক কেটে যাবার পর জবাই একদিন বলেছিল,

জানেন দাদা— আমার না আজকাল ভীষণ ভয় করে।

কেন? ফাইল বন্ধ করে অবাক্ হয়েই প্রশ্ন করেছিল সুব্রত।

সুব্রতর পাশের চেয়ারে বসে জবা বলেছিল—আজকাল প্রায়ই বড়সাহেব আমাকে সঙ্গে যেতে বলছেন। একটা না একটা বাজে কাজে বেশী সময় ঘরে বসিয়ে রাখছেন। তাই ভাবছি হয়ত চাকরিটা থাকবে কি-না।

মাথা নীচু করে কথা শেষ করে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়েছিল জবা। সুব্রতর এখানে ঘণ্টা তিনেকের কাজ। এখানকার হিসেবের খাতাগুলো ঠিকমত করে দেওয়া। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সুব্রতর অফিসের আগরওয়ালা সাহেবের ঘরেই একদিন পরিচয় হয়েছিল। আর একাউন্টসে সুব্রতর ভাল দখল জেনে এখানকার বড়সাহেব শরদিন্দু মুখার্জীই প্রস্তাবটা করেছিলেন আগরওয়ালা সাহেবের কাছে। সুব্রতও বাড়তি কাজের কথা শুনে না করতে পারে নি। অফিসের পর বাড়ি

ফিরতে এমনিতেই তো রাত হয়। তার চেয়ে ঘণ্টা তিনেক এক জায়গায় বসে একটু অঙ্ক মেলালে যদি মাসে কিছু টাকা হাতে আসে মন্দ কি!

বিপত্নীক শরদিন্দু মুখার্জীর নামে এ অফিসে ঢুকেই কিছু সরস মন্তব্য শুনেছিল সুব্রত। কিন্তু সেসব নোংরা কথায় ও কান দেয় নি। কিন্তু জবা যে কথা বলছে তাতে সত্যিই একটু নড়ে বসে সুব্রত। জবার কথা শেষ হতেই ও গম্ভীর হয়ে বলেছিল—

আমার সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তা আছে—এই কথাটা মুখার্জী সাহেবকে বুঝিয়ে দাও না দেখবে তাহলে আর বিরক্ত করবে না।

জবা চলে যাচ্ছিল, সুব্রত ওকে আবার ডাকল—আর শোন, এই যে অফিস ছুটির পরও তোমাকে থাকতে হয়—সেটা ভালই হয়েছে। তুমি বরং আর একটু বেশী সময় থাকবে।

কেন দাদা?

হ্যাঁ—তাহলে আমার কাজ শেষ হলে দুজনে একসঙ্গে বেরব। আর আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে দেখলে মুখার্জি সাহেব কিছু বলার মত কথা পাবেন বলে মনে হয় না।

সুব্রতর প্রস্তাবটা মনে ধরেছিল। অফিসের নির্ধারিত ছুটির পরও মুখার্জি সাহেবের নোট নেওয়ার জন্য এমনিতেই থাকতে হত জবাকে। তারপর কোনও কোনওদিন উনি গাড়িতে লিফট দিতে চাইতেন। সুব্রতর কাছে কথার আশ্বাস পাবার পর থেকে জবা সুব্রতর সঙ্গেই বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে সুব্রতর হিসেবের খাতাও নিয়ে বসে জবা। সব মিলিয়ে পাঁচজন অফিস ছুটির পরও কাজ করে। জবা বসে থাকে শুধু মুখার্জি সাহেবকে এড়িয়ে চলার জন্য।

এই তো হল আসল কথা। তাই বলে জবার সঙ্গ জীবনকে এক করে একটা স্বপ্নবাসর গড়ার কল্পনা তো কোনওদিন মনে আসে নি সুব্রতর। একথা ভাবাও যে অন্যায়! কিন্তু তবুও মানসী, ভূপতির মুখে মিথ্যে এক কল্পনার ছবির কথা শুনে সুব্রতকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছে। হয়ত জবার অনুরোধে কোনওদিন সুব্রত ধর্মতলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওকে টালিগঞ্জের ট্রামে তুলে দিয়েছে। আবার জবাকে ছোট বোনের স্নেহ দিতে কোনও দিন এক ঠোঙ্গা বাদাম বা ঝালমুড়ি খেতে খেতে মনুমেন্টের নীচে জবারই অনুরোধে কিছু সময় বসে ওর দুঃখের পাঁচালী শুনেছে।

তারপর মন ঠিক করে শক্ত হাতে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার উপদেশ দিয়ে ট্রামে তুলে দিয়েছে। হয়ত বা সেই সব দিনের কোনও এক মুহূর্তে ভূপতি ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেই এই মিথ্যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। ফুলদার কাছে সহজভাবে সব কিছু জেনে নেবার সাহসটুকুও তো নেই। ভীরু-কাপুরুষ একটা।

মনে মনেই ভূপতিকে গালাগাল দিয়ে ওঠে সুব্রত। আজ কিন্তু বেশ একটা খুশী মন নিয়েই বাইরে বেরিয়েছিল সুব্রত। মানসীকে চমক দেবার জন্যই আগে থাকতে কিছু বলে নি। সংসারের নানান ঝামেলায় ইদানীং মানসীকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া গতকাল একটা খিটিমিটি হওয়ায় সুব্রতর মনটাও খারাপ হয়েছিল। যদিও এ রকম কথা কাটাকাটি আজকাল প্রায়ই হচ্ছে তবুও মানসীকে একা অনেক কিছু সহ্যও তো করতে হয়। তাই সুব্রত ভেবেছিল, ছুটির দিন আজ। একটা ভাল ইংরেজী সিনেমা এসেছে পম্পা সিনেমায়। দুটো টিকিট কেটে এনে মানসীকে অবাক করে দেবে। অনেকদিন থেকে ইংরেজী সিনেমা দেখার শখ মানসীর। কিন্তু কি করতে যেতে কি ঘটে গেল।

বার বার শুধু একই চিন্তার জাল ছায়া ফেলছে মনে। ভূপতিটা যে এমন ছেলেমানুষের মত মানসীর অবুঝ মন জেনেও সুব্রতর সম্বন্ধে একটা খারাপ কথা বলবে এটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ ভূপতির নিজের জীবনেই যে চরম একটা অপ্রীতিকব অবস্থার সৃষ্টি হয়ে আছে, সে কথা সুব্রত আজ পর্যন্তও কাউকে বলতে পারে নি! বরং সেই দুরূহ সমস্যার যাতে একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়, সেই চেষ্টাটুকু কি ভাবে করা যায় তাই চিন্তায় রেখেছিল সুব্রত। ভূপতির জীবনের সেই অধ্যায়টা একদিন নাটকীয় ভাবেই আবিষ্কার করেছিল সুব্রত।

বিয়ের কথা উঠলেই কেন ভূপতি অমন বেঁকে বসে, তারও একটা সহজ মানে খুঁজে পেয়েছিল সেদিন। রাঙ্গা মাসীমা-মেসোমশাইকে তো নয়ই, এমন কি মানসীর কাছেও সেকথা প্রকাশ করে নি সুব্রত। মানসীকে বললে ও যদি আবার হঠাৎ রাঙ্গামাকে বলে দেয় সেই একটা ভয়ও ছিল। ভূপতিকে অত্যন্ত স্নেহ করে বলেই ওর কথাটা মনের গভীরে আঁকা ছিল।

এই চাকরির আগে কলকাতায় একটি মেয়েকে পড়াত ভূপতি। ও'দের সেই শ্যামবাজারের বাসার কাছেই ছিল মেয়েটির বাসা। পড়াতে পড়াতেই দু'জনার মন দেয়া নেয়ার পালা শুরু হয়। কিন্তু মেয়েটির সাহস থাকলেও লাজুক ভূপতি ওর বেশি এগিয়ে যেতে সাহস পায় নি। তা ছাড়া ভূপতির বাড়ির পরিবেশে এসব একেবারেই বে-মানান। কিছুদিন নিজেই এগিয়ে এসে তারপর ভূপতির কাছ থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ায় মেয়েটিও ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ভূপতি ওখানকার টিউশানি ছেড়ে অন্য জায়গায় একটা কাজ শুরু করে।

প্রথম যৌবনের সেই মধুর আবেগ ওর মনে কিন্তু গাঁথা হয়ে থাকে। মেয়েটির কাঁচা হাতের লেখা চিঠি ও সযত্নে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে সেই চিঠিগুলোই ওকে সান্ত্বনা দেয় শুধু। পরে সেই মেয়েটিরও এক ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের এমনি এক পরিহাস, সেই মেয়েটিই আবার] ভূপতির জীবনে ফিরে এসেছে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। আর ভূপতিও এখন নতুন করে ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার

স্বপ্ন দেখে চলেছে। বিয়ের দু' বছরের মধ্যেই মেয়েটির স্বামী এক বাস অ্যাকসিডেন্টে নাকি মারা যায়। সে এক চরম দুঃসহ অবস্থা। একটি ছেলেও হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে অনেক গঞ্জনা সহ্য করে শেষে একমাত্র ছেলের কথা চিন্তা করেই বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে মেয়েটি।

ভাইদের ঘরে সুব্রত খুব দরকার না পড়লে যায় না। তবে ভূপতির কাছে গল্পের বই থাকে বলে ওর ঘরে মাঝে মাঝে গিয়ে বই নিয়ে আসে। সেই রকমই একদিন বই আনতে গিয়ে হঠাৎই মেয়েটির একটি চিঠি দেখতে পায় সুব্রত। ভূপতি তখন ঘরেও ছিল না। বোধ হয় বাথরুমে ছিল। চুপি চুপি চিঠিটা পড়ে সুব্রতর মাথাটাই ঘুরে উঠেছিল হঠাৎ। আরে বাবা এ যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ওরা। কিছু পরে ভূপতি ঘরে ঢুকতেই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল সুব্রত—

তনিমা কে রে?

সুব্রতর প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে ভূপতি। তারপর মুখে সহজ ভাব এনে বলে—কি করে জানব? ও নামের কোনও মেয়ে হবে হয়ত!

তুই চিনিস না ওই নামের কোনও মেয়েকে?

এবারে আর এড়িয়ে যেতে পারে নি ভূপতি। সুব্রতর একের পর এক সব প্রশ্নেরই জবাব মাথা নিচু করেই দিয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভূপতির সেই নাটকীয় প্রেম কাহিনীটা শুনেছিল সুব্রত। তনিমার কথা সুব্রতর কাছে খোলাখুলিভাবেই বলেছিল ভূপতি। কিছুই বাদ দেয় নি। শেষে, হঠাৎই সুব্রতর একটা হাত ধরে বলল—

তোমাকে সবই বললাম ফুলদা। তনিমাকে আমি কথা দিয়েছি, ওর সন্তানের ভার নিয়েই ওকে আমি গ্রহণ করব। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করবে কথা দাও।

ভূপতির কথা শুনে সুব্রত একটু বিব্রত হয়েছিল প্রথমে। তারপর সাময়িকভাবে ওকে শান্ত করার জন্যই শুধু নয়, নিজের মনেও একটা বোঝাপড়া করেই সুব্রত বলেছিল—

ঠিক আছে—ঠিক আছে। এখনই এত চিন্তার কিছু নেই। দেখি কতদূর কি করা যায়।

এই ঘটনার পরে সুব্রত নিজেই ভূপতির কাহিনী বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছে নিজের কাছে। সত্যিই তো এটা অন্যায় কিছুই করতে যাচ্ছে না ভূপতি। তনিমার জীবনটা হয়ত ও কাছে না গেলে নষ্টই হয়ে যাবে। একটি নিষ্পাপ শিশুরও তো কোনও দোষ নেই। লেখাপড়া খুব একটা শেখে নি তনিমা। এখন বাবাও বেঁচে নেই। ভাইদের সংসারে একটা গলগ্রহ হয়েই দিন কাটাচ্ছে। এ রকম অবস্থায় যদি ভূপতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে মেয়েটিকে স্বীকৃতি দেয়, সে তো পরম সুখের

কথা। আর ভূপতি যা বলেছে তনিমার দাদাদেরও নাকি এই বিয়েতে কোনও অমত নেই। বরং তারা কিছুটা সাহায্যও করতে পারে ভূপতিকে। কিন্তু তবুও একটা বিরাট ফাটল থেকেই যাচ্ছে। আর সেটা ভূপতির নিজের বাড়ির দিকেই। রাঙ্গা মাসীমা কিছুতেই এ সব কথা মেনে নিতে চাইবেন না। এমন কি হয়ত কিছুটা শুনেই এমন এক কান্ড বাধাবেন যার ঠেলা সামলাতে সুব্রত আর মানসীকে হিমশিম খেয়ে যেতে হবে।

যার নিজের জীবনেই এমন একটা নাটকীয় অধ্যায় ঘটতে চলেছে সেই কিনা সুব্রতর জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলছে। ভূপতিকে এতক্ষণে ভীষণ খারাপ মনে হতে লাগল।

আর কিছু চিন্তা করতেও ভাল লাগছে না। এভাবে চায়ের দোকানে আনমনা হয়ে বসে থাকাও বিশ্রী। এর মধ্যেই দু' একজন চেনামুখ কিছু রসিকতা করার চেষ্টা করে চলে গেছে। এখন বাড়ি ফিরেও লাভ নেই। তাতে আবার মানসী আরও কিছু সন্দেহ করে বসবে। তার চেয়ে অনেকদিন বেলেঘাটায় টুলু পিসীর বাড়িতে যাওয়া হয় নি।

সেখানে যাওয়াই ভাল। টুলু পিসী ওদের আপন কেউ নন। রাজমোহনবাবুর দূরসম্পর্কের মামাতো বোন। কিন্তু হলে কি হবে এ বাড়ির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। আর সুব্রতকে যেন টুলু পিসী প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। মাসে একবার করে না গেলে এই বয়সেও নিজে ছুটে আসবেন সবাইকে দেখতে। পিসেমশাই হার্ডওয়ারের ব্যবসা করতেন। কলকাতায় তিনখানা দোকান। এক ছেলে আর দুই মেয়ে টুলু পিসীর। মেয়েদের ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছেন। তারা দু' জনাই বাংলাদেশের বাইরে থাকে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে পশ্চিম জার্মানিতে পাড়ি দিয়ে সেখানেই স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। টুলু পিসিমা আর সে ছেলের নাম মুখে আনেন না। পিসেমশাই ছেলের ওই ব্যবহারের ফলেই দু'বছর হল শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন।

টুলু পিসীর কাছে গেলে অনেক ভাল লাগে। বাড়িতে যখনই এই ধরনের কোনও অশান্তি বড় আকার ধারণ করে তখনই টুলু পিসীর মুখটা মনে পড়ে সুব্রতর। ছেলেমেয়ের কত অন্যায় অবিচার সহ্য করেও টুলু পিসী হাসি মুখে কেমন সব পরিস্থিতিকে সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। মানসীর জীবনের ব্যথাটুকু টুলু পিসীর সান্নিধ্যে এলে অনেক সহজ হয়ে যায়। কয়েকবার মানসীকেও নিয়ে এসেছে সুব্রত। টুলু পিসী ক'দিন থাকতেও বলেছেন, কিন্তু রাঙ্গামা আর মেসোমশাইর কথা চিন্তা করে মানসীই থাকে নি।

চায়ের দাম মিটিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কেনে সুব্রত। তারপর টুলু পিসীর বাড়িতে যেতেই স্টেশনের রাস্তার দিকে জোরে পা চালায়।

সুব্রতর সঙ্গে মানসীর ওই রকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবার পর ভূপতির মনেও একটা ভয় এসে বাসা বেঁধেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর মাথার মধ্যে দপদপানি শুরু হয়। মানসীর কাছে সুব্রতর কথাগুলো না বললেই ভাল ছিল। এমনিতেই মেয়েরা সন্দিগ্ধমনা হয়। তার উপর স্বামীর সঙ্গে অন্য মেয়ের চলাফেরার খবর পেয়ে কোনও বিবাহিতা মেয়েই স্থির থাকতে পারে না। তবুও তো মানসী কিছুদিন চুপ করে ছিল। হয়ত ফুলদার সঙ্গে সেই মেয়েটির যে কথা ভূপতি আন্দাজে ভেবে নিয়ে মানসীকে বলেছিল আসলে সে রকম কোনও ব্যাপারই নয়। তাছাড়া সুব্রতকে তো আর নতুন করে চিনছে না ভূপতি। সত্যিই ফুলদার সম্পর্কে সব কিছু পরিষ্কার না জেনে ছেলেমানুষের মত এ রকম একটা কথা সহজেই মানসীকে বলা খুবই ভুল হয়েছে।

এ সব কথা ভেবে এখন মনে মনে অনুতাপই হচ্ছে ভূপতির। বাড়িটাও যেন কেমন হয়ে গেছে। সবাই সবার সঙ্গে কথা বলে ঠিকই। কিন্তু সে সব কথায় যে আর আগের মত প্রাণের সাড়া নেই সেটুকু সবাই বুঝতে পারে। একটা দিনও মানসীর সঙ্গে মার কথা কাটাকাটি বাদ যায় না। সেই অশান্তির আগুনে বৃত্তের মত ওরা সবাই গোল হয়ে ঘুরে যায়। অথচ, সেই আগুন নেভাবার মত কোনও উপায় কেউই করতে পারে না।

ভূপতির কেবলি মনে হচ্ছে, এই রকম মনের পরিস্থিতিতে ফুলদা যদি ওর আর তনিমার কথাটা রাগের মাথায় মাকে বলে দেয়, তাহলে ভূপতি আর মুখ দেখাতে পারবে না।

ওদিকে তনিমাও দিনের পর দিন মুষড়ে পড়েছে। ভূপতি যতবার ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

এত অবুঝ হলে কি চলে। তুমি তো জান আমার বাড়ির পরিবেশে প্রথমে কিছুতেই তোমাকে মানানো যাবে না। তাই ফুলদাকে দিয়েই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

ভূপতির কথায় কেঁদে ফেলে তনিমা। আবার বলে, —কিন্তু আমিই বা কত দিন আর এভাবে অপেক্ষা করব বলতে পার? বৌদিরা তো আছেনই, আজকাল দাদারাও অনেক কথা শোনাচ্ছে। কথাগুলো বলে অবুঝ মেয়ের মত কাঁদতে থাকে তনিমা। ভূপতি ওকে মাথায় হাত দিয়ে আশ্বাসের বাণীই শোনায়।

তনিমার সান্নিধ্য ওকে যে আবার নতুন করে সব কিছু গড়ার সাহস জুগিয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রথম যৌবনের সেই মিষ্টি রেশটুকুও যেন ফিরে পেয়েছে ভূপতি। তখন কত ভয় ছিল মনে। এখন বলতে গেলে কোনও বাধাই নেই। তনিমাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে তুললে প্রথমে যে পারিবারিক বিধি নিষেধের গন্ডী সামনে আসবে, সে বাধা কাটিয়ে ওঠার মত সাহসও মনের পরিধিতে জমা

হয়েছে। তাই ভূপতিও আর দেরী করতে চায় না। মা যেভাবে মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন, তাতে হঠাৎ আবার কী ঘটে যায় কে বলতে পারে?

তনিমার সঙ্গে দেখাশোনা ওদের বাড়িতেই বেশী হয়। প্রথম প্রথম ওদের বাড়িতে বেশ গুঞ্জনও উঠেছিল। কিন্তু পরে. তনিমার দুই দাদা যখন ভূপতিকে সব রকমে যাচাই করে বুঝতে পারল যে না, ভূপতির মনে সত্যিই তনিমার জন্য একটা স্থায়ী আসন পাতা আছে তখন আর কোনও বাধা আসে নি।

মনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করেই তনিমাকে গ্রহণ করার কথা স্থির করেছে ভূপতি। প্রথমে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তনিমার ছেলেটা। কিন্তু একাকী নিজের সঙ্গে এই বিরাট ব্যাপারের সমাধানের প্রশ্নে নিজেকে বুঝিয়েছে ভূপতি: ওই নিষ্পাপ ছোট্ট ছেলেটার এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকাই থাকতে পারে না। ওকে নিয়ে মিথ্যে ভাবনারও কিছু নেই। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে যে স্বপ্নের নীড় তনিমার জীবনে বাঁধা হয় নি, তাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে ওই ছেলেটা বাধা হতে পারে না। ও আছে বলেই বরং তনিমা আবার ফিরে এসেছে ভূপতির জীবনে।

যোগাযোগটাও আকস্মিক ভাবেই ঘটেছিল। অফিস ছুটির পর সেদিন ভূপতি হঠাৎই শ্যামবাজারে গিয়েছিল! একটা পত্রিকায় অনেকদিন আগে দু'টো কবিতা দেওয়া ছিল। সেই খবর আনতেই যাওয়া। ফেরার পথে বাবার একটা ওষুধ কিনতে মোড়ের বড় ওষুধের দোকানে ঢুকতেই তনিমার সঙ্গে মুখোমুখি। নিরাভরণা শুভ্রবেশী তনিমাকে দেখে প্রথমে চমকেই উঠেছিল ভূপতি। তনিমাই আগে কথা বলে ওকে সহজ করে তুলেছিল সেদিন। ভূপতির অবাক্ হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে তনিমা বলেছিল—

চিনতে পেরেছ তো—?

হ্যাঁ—মানে তুমি তো তনিমা। —বিড়বিড় করে বলেছিল ভূপতি। ভূপতির কথায় হেসে তনিমা আবার বলেছিল,

ঠিকই ধরেছ—আমি তো তোমাকে দূর থেকেই চিনেছিলাম। তাই তো কাজ হয়ে গেলেও একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কেন?

মনে হল তুমি যেন এ দোকানেই আসছ—তাই।

তোমার এ অবস্থা কবে হ'ল। রাস্তায় নেমেই প্রথম প্রশ্ন করে ভূপতি। ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে তনিমাও নিজের ব্যর্থ বসন্তের কথা ধীরে ধীরে বলে যায়। তনিমার অনুরোধেই সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল ভূপতিকে। কারণ তনিমার দাদাদের চিনলেও বৌদিরা সম্পূর্ণ অচেনা।

তা' সেই হ'ল শুরু। তারপর তো ধীরে ধীরে সব কিছুই সহজ হয়ে উঠল।

তনিমার জীবনকাহিনী শুনে ভূপতি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। তনিমা কিছু বলার আগে ওই তাকে গ্রহণ করে পূর্ণ স্বীকৃতি দেবার কথা শোনাল। ভূপতির কাছে আশ্বাসের কথা শুনেই তনিমা এখন বারবার তাগাদা দিচ্ছে। এতে সত্যিই ওর কোনও দোষ নেই।

বাড়িতে, মানসীর কাছে আজ মিথ্যে কথাই বলে এসেছে ভূপতি। আসলে তনিমাকে নিয়ে আজ ওর সিনেমায় যাবার কথা আছে। কলেজ স্ট্রীটের মার্কেটেই এক পাবলিশারের বাসা, সেখানেও অবশ্যি যাবার কথা ছিল। কিন্তু সেইটাই সব নয়। আজ শ্যামলকে নিয়ে মা যে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন হয়ত নিশ্চয়ই সেই বাড়িতে। এর আগেও ভদ্রলোক কয়েকবার ভূপতিদের বাড়িতে এসেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ভূপতি।

একটি সুলক্ষণা মেয়ে নাকি ভদ্রলোকের আছে। পাল্টি ঘর। এখন মা-র পছন্দ হলেই সব ঠিক হতে পারে। মানসীর কাছে এই রকমই কিছু কথা শুনেছিল ভূপতি। মাকেই যত ভয়। যা রাগী মেয়েছেলে। কারও কোনও কথাই নিজের যুক্তির কাছে স্বীকার করেন না। এই, তো গত সপ্তাহেই হঠাৎ ভূপতির ঘরে রাত্রে এসে একেবারে হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। ভূপতি আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছিল। ঠিক তখনই মা এসে বললেন।

বলি দিন দিন এত মুখ গোমড়া করে সব সময় বই নিয়ে পড়ে থাকা কেন! বাড়িতে কি লোকজন কেউ থাকে না। বউমাকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসলেও তো পারিস।

মার কথায় অবাক্ হয়েই তাকায় ভূপতি। তারপর হেসে বলে,

আমার সঙ্গে বাইরে যাবে তোমার ওই আদরের বউমা ?

নিয়ে গেলেই যাবে। কোনও দিন বলে দেখেছিস ? তোরা সবাই শুধু নিজেরটা নিয়েই ভাবিস। দাঁড়া, আমিও তোকে শায়েস্তা করার লোক আনছি।

কথাগুলো বলেই যেমন এসেছিলেন, তেমনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মা। ভূপতি আবার মনে মনেই হেসে বুঝল, কিছুক্ষণ আগে মানসীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলেই এ ঘরে এসেছিলেন মা। আর ফলস্বরূপ ভূপতিকে কিছু অন্যায় কথা শুনতে হ'ল।

এইরকম প্রায়ই ঘটছে। মানসীও যে কোনও কথাতেই বিয়ের কথা তুলছে। আর চুপ করে থাকলে হয়ত একটা বিশ্রী কাণ্ডই ঘটে যাবে। নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে তনিমাদের বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করে ভূপতি। রিক্‌শা স্ট্যান্ড থেকে একটা রিক্‌শা ডেকে উঠে বসে স্টেশনের দিকেই যেতে বলে—।

রান্নাঘরে ঢুকেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মানসী। বাজারের থলি নামিয়ে অনাদি বলে,

আমার একটা মিটিং আছে বৌদিভাই। মিউনিসিপালিটির ইলেকশানের জন্য কয়েক জায়গায় ঘুরতেও হবে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি খেয়ে নিও।

আমি কি একলা থাকব বাড়িতে? ছুটির দিনে তোমরা সবাই যে যার খুশীমত বেরবে—একা আমি শুধু শুধু—।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে এতক্ষণে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মানসী। অনাদির মুখে আর কথা যোগায় না। যদিও অনাদি বুঝতে পারে ফুলদার সঙ্গে নিশ্চয়ই এমন একটা ঘটনা বৌদির ঘটেছে যার ফলে এই পরিস্থিতি। অন্ততঃ এখনকার মানসীর মন বুঝেই ও তাই এবার অন্য সুরে বলে,

এই দেখ—আবে আমি কি বাইরে কোথাও যাচ্ছি না-কি! মিউনিসিপালিটির অফিস তো সামনেই। আচ্ছা ঠিক আছে—আমি না হয় খাওয়া-দাওয়া সেরেই মিটিং-এ যাব। বেলাও হয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা ওদের জানিয়ে আসতে হবে যে!

সে কোথায়—?

সেটাও দূরে নয়—বাজারের মোড়ে সবাই অপেক্ষা করছে। আমি যাব আর আসব। তুমি ততক্ষণ আমার জন্য একটু চায়ের জল বসিয়ে দাও। কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ায় না অনাদি। বাজারের থলি নিয়ে কলতলায় যায় মানসী। অনাদি বাজারে গেলই এই আর এক ঝামেলা বাধাবে। মাছ আর তরকারি একসঙ্গে এনে সব একাকার করবে।

অনাদির জন্যই শুধু নয়—দু' কাপ চা করে কাপে ঢালতেই অনাদি এসে গেল। এরকম কথার ঠিক ওর হয় না। মানসী ওকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে খুশীই হয়। মানসীর মন ভাল করতেই অনাদির ফিরে আশা। হাসি মুখেই ওর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় মানসী। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অনাদি বলে,

কথা শেষ না করতেই—যা শুরু করেছিলে না—আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

মানে—! মানসী মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই অনাদি আবার বলে,

মানে—কান্নার মেঘ দু'চোখে জমাই ছিল—আমাকে দেখে বর্ষণ শুরু হ'ল। আমি ভাবলাম—কি জানি বাবা কিছু না করেই যদি দোষের ভাগী হই—তাহলে আর রক্ষে নেই। তাইতো সব প্রোগ্রাম অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে স্ট্রেট তোমাকে খুশী করতে চলে এলাম।

বেশ করেছ। আমি খুশি হলে তোমার যদি ভয় দূরে যায়—তবে আমি খুশী হয়েছি তোমার ফিরে আসায়।

নাও, এবার তাহলে বল আনাজ কি কাটতে হবে?

অনাদির এ কথায় জোরেই হেসে ফেলে মানসী। তারপর চায়ের কেটলি-কাপ ডিস ধুয়ে সরিয়ে রেখে হাসতে হাসতেই বলে,

আমাকে আর আনাজ কেটে দিতে হবে না। সে তোমার বউ ঘরে এলে সাহায্য করো। এখন শুধু বাড়িতে থেকে আমাকে খুশী কর।

হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনাদি। বেলা হয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশী রান্নার ঝামেলায় যায় না মানসী। কাটা মাছ এনেছে অনাদি। শুধু মাছের ঝোল আর একটা তরকারি করে নেয়। মনে মনে আগেই ঠিক করে রেখেছিল আজ দুপুরে কিছুতেই খাবে না। এমনিতে খাওয়ার ওপর রাগ করে না মানসী। রাঙ্গা মাসীমার অন্যায় কথার পরেও মুখ বুজে খেয়ে নেয়। আজ কিন্তু সুব্রতর ব্যবহারে মনটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। খাওয়ার ইচ্ছেই জাগছে না মনে। তাছাড়া সে মানুষটাই বা সারাদিন কোথায় কি খাবে!

অনাদিকে ভাত দিয়ে স্নান করতে যায় মানসী। দু'জনে একসঙ্গে খাবে বলে অনাদি খেতে বসছিল না প্রথমে। কিন্তু মানসী ওকে কাজের কথা বলে বুঝিয়ে খেতে বসায়। খাওয়া শেষ করে বাড়িতে থাকে না অনাদি। মানসীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিটিং-এর জন্য বেরিয়ে যায়। মানসীও আর অমত করে না। এখন বরং একা থাকতেই ভাল লাগছে।

বিকেল গাড়িয়ে গেছে। দুপুরে আজ ঘুমোয়নি মানসী। ঘরের সব পুরনো জিনিসগুলো ঠিকমত গুছিয়ে রেখেছে। বহুদিন পরে বাক্স খুলে সুব্রতর দেওয়া কয়েকটা চিঠি আবার পড়েছে। বিয়ের পর লিখেছিল সুব্রত। গড়িমসি করেই বেলা গেল। রাঙ্গা মাসীমারা কখন ফিরবেন কে জানে! সুব্রত-ভূপতি ওরাও ফিরল না। এতক্ষণে সুব্রতর জন্য ভয়ই করতে লাগল মানসীর। কি দরকার ছিল তখন ওভাবে কথাগুলো বলার! সকালের কথাগুলো মনে পড়ে এখন নিজের উপর রাগই হচ্ছে মানসীর।

কয়েক কাপ চা ছাড়া আজ কিছু খায় নি মানসী। এখন খিদেও নেই। দুপুরের পর শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। মাথার দপদপানিটুকু সমানভাবেই আছে। ঘর থেকে বাইরে এসে একটু সময় কি যেন চিন্তা করে মানসী। তারপর আর দেরি না করে রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করতেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। আজ সবার জন্য রুটি করতে ভাল লাগছে না। রাঙ্গা মাসীমা আর মেসোমশাইর অল্প কয়েকখানা রুটি করে সবার জন্য ভাত করার কথাই ঠিক করে মানসী। ওবেলার মাছও রাখা আছে। থালায় আটা নিয়ে জল ঢেলে দেয়।

সন্ধে গাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে অনাদি একবার এসে ওর কয়েকটা প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে আবার বেরিয়ে গেছে। ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখিয়ে মানসী চুল বাঁধছিল। বাইরে ট্যাক্সির শব্দ হতেই সচকিত হল। বোধহয় রাঙ্গা মাসীমারা ফিরলেন।

মুখের থমথমে ভাবটুকু যতটা সম্ভব সামলে নিয়ে বারান্দা থেকে নীচে নামে মানসী।

হাসিখুশী মুখেই ঢুকছেন রাঙ্গা মাসীমা। শ্যামল বাবাকে ধরে নিয়ে আসছে। মানসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ব্রজমোহনবাবুর হাত ধরল। ওকে দেখেই শ্যামল জোরে বলে ওঠে,

আজ মাদার যা কাণ্ড করে এসেছে না বৌদি—শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।

আবার শুরু হ'ল। সারাটা পথ তো বকতে বকতেই এলি। আবার বাড়িতে পা দিয়েই শুরু করলি। তুই দেখছি মেয়েছেলেরও অধম।

রাঙ্গা মাসীমা যেতে যেতেই ধমক দেন শ্যামলকে। মার মুখের দিকে তাকিয়েই শ্যামল আবার বলে,

আহা—সব তো তোমার ভাল কথাই বলছিলাম। এতো আর আমাকে বকা নয়। হাজার হলেও চাকুরে ছেলের বিয়ে বলে কথা। এইটুকু বলেই জিভ বের করে শ্যামল আবার বলে,

এই রে—সবই যে আমি বলে দিচ্ছি। না বাবা আর নয়। তুমি মার কাছেই সব শুন বৌদি। আমি বেরচ্ছি—ফিরতে দেরি হবে।

আর দাঁড়ায় না শ্যামল। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে হাত ধরে ব্রজমোহনবাবুকে উপরের ঘরে নিয়ে যায় মানসী। পা দুটো মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। এতটা পথ যাতায়াতে—শরীরের ধকলও গেছে। একটু অসুস্থও বোধ করছিলেন মেসোমশাই। হাত পাখা নিয়ে মাথায় হাওয়া করতে থাকে মানসী। রাঙ্গা মাসীমা হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়েছেন। ঠাকুরঘরে প্রণাম সেরে তিনিও ঘরে এসে বসলেন। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই বললেন রাঙ্গা মাসীমা—

একেবারে পাকা কথা দিয়েই এলাম বউমা—।

কিসের কথা মা? বুঝতে না পেরেই রাঙ্গা মাসীমার মুখের দিকে তাকায় মানসী। রাঙ্গা মাসীমা একই সুরে আবার বলেন,

বড় খোকার মেয়ে দেখে এলাম। তোমাকে তো আগে বলে যাইনি। ও"র সেই বন্ধুরই ভাইয়ের মেয়ে। রংটা একটু মাজা, তবে গড়ন পেটন ভারি সুন্দর। দু'টো পাশও দিয়েছে। আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। এখন তোমরা একদিন দেখে এস, তাহলে ওরা কথা বলতে আসবে।

একটানা কথা বলে চুপ করলেন রাঙ্গা মাসীমা। মানসী কিছু একটা বলা দরকার বলেই বলে,

তাহলে তো খুব ভাল খবর। ঠাকুরপোকে আজই বলতে হবে কথাটা।

সে যা হয় তুমি বলো। তবে—এবার আর ওর কোনও কথাই শুনছি না

আমি। তোমার মেসোমশাইও তাই বলেছেন। কি গো—বউমাকে তুমি বল না কিছু। ব্রজমোহনবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বলেন রাঙ্গা মাসীমা। মেসোমশাই ঘুরে শুয়ে বলেন—

আমি আবার নতুন কথা কি বলবো। সব তো তুমিই বলছো।

কথার ছিরি দেখলে গা জ্বলে যায়। বিয়ের কথার কি শেষ আছে। কথায় বলে—লাখ কথা না হলে বিয়েই হয় না। কেন—তোমার মনে নেই অনুদির মেয়ের বিয়ের সময় কি রকম কথা হয়েছিল !

এই নাও আবার শুরু হ'ল বাপের বাড়ির গল্প।

কি বললে—আমি কথা বললেই বাপের বাড়ির গল্প হয়। বেশ - ছেলেদের বিয়ের কোনও কথাতেই আমি আর থাকবো না। যা বলতে হয়—করতে হয় সব তুমি একা করো—।

রাঙ্গা মাসীমার এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে মানসীর বেশ মজা লাগে। আবার এরকম পরিস্থিতিতে বিব্রতও বোধ করে। এখন রাঙ্গা মাসীমাকে রাগানো মোটেই ঠিক হবে না। ও তাই ব্রজমোহনবাবুকেই বলে—

আপনি চুপ করুন না মেসোমশাই—রাঙ্গামা তো ঠিক কথাই বলছেন। ঠাকুরপোর কোনও কথাই আর শুনবো না আমরা। বিয়ের দিন ঠিক করেই ওকে জব্দ করতে হবে।

ঠিক বলেছ বৌমা—আমিও তাই ভেবেছি। কথাটা বলেই একটু দম নেন রাঙ্গা মাসীমা। তারপর যেন কথাটা ভুলেই ছিলেন এইভাবে বলেন, সুবি-ভূপতি-ওরা সব কোথায় বৌমা ! বাড়িতে ঢোকা অব্দি কারও সাড়া পাচ্ছি না। সিনেমায় গেছে নাকি ? রাঙ্গা মাসীমার এই হঠাৎ কথা পরিবর্তনে মানসীও একটু চমকে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

না, সিনেমায় নয়। হয়ত বাইরেরই কোনও কাজে গেছে।

কেন—তুমি জান না— !

হ্যাঁ—না—মানে আপনার বড় ছেলে তো বলছিল, আজও নাকি কি একটা কাজ পড়েছে তাই কলকাতায় যেতে হবে। আর রাঙ্গা ঠাকুরপোও কলকাতায় বইয়ের দোকানে গেছে। মেজোঠাকুরপো বাড়িতেই ছিল। বিকেলে কি একটা মিটিং-এর জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গেছে। তা' আপনি কি এখন চা খাবেন রাঙ্গামা ! প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে মানসী। রাঙ্গা মাসীমা হয়ত মানসীর মুখ দেখেই কিছু একটা বুঝে ফেলেন। তাই তিনিও প্রথম কথা আর না তুলে বলেন,

না—চা-জল খাবার তো সেখান থেকেই খেয়ে এসেছি। রাতও হয়ে আসছে। তুমি বরং খাবারটাই উপরে দিয়ে যেও। সকাল করেই শুয়ে পড়ব আজ।

নীচে নেমে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মানসী। এখুনি জেরার মুখে

পড়ছিল। আনমনাভাবেই নিজের ঘরে ঢোকে আবার। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না। কোথায় যে গেল লোকটা! এ রকম তো কোনও দিন করে না সুব্রত। কথা কাটাকাটি এর আগেও অনেক হয়েছে। আর আজকাল তো এসব নিয়ে বেশী কথাই বলত না সুব্রত। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে—এখন রাত প্রায় আটটা বাজতে চলল, এখনও ফিরছে না। ভূপতি অবশ্য বলেই গেছে ফিরতে রাত হবে। ও তো অনেকদিন শেষ গাড়িতেও ফিরে আসে। এদিকে রাঙ্গা মাসীমা তো মেয়ে দেখে পাকা কথা দিয়ে এলেন। এবার যিনি বিয়ে করবেন—তিনি আবার কি করেন কে জানে!

সুব্রতর কথা বারবার মনে আসায় এখন নিজের উপরই ভীষণ রাগ হচ্ছে মানসীর। অন্যায়ভাবে তখন সুব্রতকে কথাগুলো না বললেই হ'ত। কিন্তু রাগ মাথায় উঠলে মানসীর তো আর জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া ভূপতির কথাগুলোই যে সব সত্যি তারই বা প্রমাণ কোথায়? হয়ত মানসীকে রাগানোর জন্যই ওকথাগুলো বলেছিল ভূপতি। সুব্রতর সঙ্গে মেয়েটির চাকরির কোনও কথাও তো থাকতে পারে। না—আর ভাবতে পারছে না মানসী। সমস্ত দিনের না খাওয়ায় শরীরও আর বইছে না। কোনওরকমে নিজেকে সংযত করে রাঙ্গা মাসীমাদের খাবার আনতে বাইরে বেরুতেই—থেমে যায় মানসী।

সামনের দরজা দিয়ে সুব্রত ঢুকছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির ছাপ ফুটে আছে সমস্ত চোখে মুখে। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সুব্রতর দিকেই তাকায় মানসী। তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

সুব্রতও মানসীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওর অত তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে যাওয়া দেখে কিছু না বলে একটু হাসল সুব্রত। অবুঝ মেয়েটার রাগ এখনও পড়ে নি। আস্তে আস্তে নিজের ঘরেই ঢুকল সুব্রত।

রাঙ্গা মাসীমা আর মেসোমশাইর খাবার উপরে দিয়ে আবার রান্নাঘরেই এল মানসী। ছুটির দিনে রাত হয় বলেই ভূপতি আর অনাদির খাবার ঘরেই ঢাকা দিয়ে রাখল মানসী। কোন্ বাবু কখন ফিরবেন কে জানে! এবার কি করবে ভেবে পায় না মানসী। একসঙ্গে অনেক কথা বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু করেছে। অশান্ত মনটাকে শান্ত করার জন্যই মানসী এবার ওর আর সুব্রতর খাবার একসঙ্গে বেড়ে নিয়ে নীরবে ঘরে ঢুকল।

রাঙ্গা মাসীমাকে সুব্রতর ফিরে আসার খবর দিতেই তিনি নীচে নেমে আসছিলেন। কিন্তু মানসীই তাকে বারণ করেছে। এখন শরীরের ক্লান্তি নিয়ে আর কথা বলা ঠিক হবে না। কাল সকালে সব কথা বললেই চলবে। মানসীর কথায় রাঙ্গামাও আবার শুয়ে পড়লেন।

আলনার কাছে দাঁড়িয়ে চুপ করে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে দাগ

কাটছিল মানসী। সুব্রত বুঝতে পারছে ইচ্ছে করেই কোনও কথা বলছে না মানসী। কিন্তু এভাবে চুপ করে কতক্ষণই বা থাকা যায়! বিশেষ করে সকালবেলায় অমন একটা কাণ্ড যখন ঘটে গেছে। তাই অভিমানের পালা শেষ করতেই সুব্রত একটু হেসে বলে,

খাওয়া হয়েছে তোমার।

সুব্রতর মুখের দিকে একটু তাকিয়েই আবার মাথা নীচু করে মানসী। সব জেনে আর বুঝেও লোকটা কেমন কথা বলছে। সুব্রতর খাওয়া না হলে মানসী যেন কোনও দিন খায়! আজ তো কথাই নেই। মানসীর সেই নিশ্চুপ ভাব দেখে আর বসে থাকতেও পরে না সুব্রত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মানসীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। এতক্ষণের অবদমিত কান্নার বেগ আর চেপে রাখতে পারে না মানসী। সুব্রত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। সুব্রতর বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মানসী।

এ রকম যে ঘটবে, তা সুব্রত জানে। ইদানীং মানসী এইরকম হঠাৎ রেগে গিয়ে সুব্রতকে ভীষণভাবে কথার আঘাত দিচ্ছে। আবার সুব্রতর সামান্যতম স্নেহ আর ভালবাসার স্পর্শে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। প্রতিনিয়ত এইভাবে এক দ্বৈত দ্বন্দ্বের চাপে নিজেকে মাঝে মাঝেই হারিয়ে ফেলছে মানসী। ওর মাথায় গভীর আবেগে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই বলে সুব্রত—

অনেক রাত হয়েছে--চল খেয়ে নি। কাল ভাবছি অফিসে আর যাব না।

কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন! মানসী এবার মুখ তুলে তাকায়।

ওর হাত ধরে চেয়ারে বসে সুব্রত বলে—

টুলু পিসীর ওখানে—বেলেঘাটায়। কিন্তু না গেলেই ভাল ছিল। পিসেমশাইর যে অবস্থা দেখে এলাম আর হয়ত বেশীদিন বাঁচবেন না। টুলু পিসীর অবস্থাটাই সবচেয়ে করুণ।

কেন?

সে অনেক কথা। কর্মচারীদের দিয়ে কি দোকান ঠিক রাখা যায়? তারা সব লুটেপুটে খাচ্ছে। ছেলে তো একটা চিঠি দিয়েও খবর নেয় না। তোমার কথাই বার বার বলছিলেন টুলু পিসী।

আমাকে তো তুমিই নিয়ে যাও না।

এবার সত্যি যেতে হবে। আর রাঙ্গামাকেও কাল বলব কদিন টুলু পিসীর ওখানে তোমাকে রেখে আসব।

তবেই হয়েছে। এদিকে রাঙ্গামা ঠাকুরপোর মেয়ে দেখে সব ঠিক করে এসেছেন জান।

ভূপতি কোথায়? এতক্ষণ যেন ওর কথা ভুলেই ছিল সুব্রত। সুব্রতর কাছ থেকে সরে এসে বলে মানসী,

বলল তো কলকাতায় কি এক বইয়ের দোকানে যাবে। ফিরতেও রাত হবে।

আমি কিন্তু এসব বিয়ে-টিয়ের কথার মধ্যে নেই। তুমি রাঙ্গামাকে বলে দিও।

জামা খুলে আলনায় রেখে বাইরে যায় সুব্রত। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখে, দুজনার খাবার ঠিক করেছে মানসী। সকালের গুমোট ভাবটা টুলু পিসীর জীবনকাহিনী আলোচনার মাধ্যমে সহজ হয়ে আসে। ভুপতির কথাটাও আর এক বার মনে এসেছিল। কিন্তু সেটা মনে চেপে রেখে, মানসীর সব ভুল চিন্তাধারাগুলো দূরে সরিয়ে ভুপতির জীবনের নাটকীয় অধ্যায়টাই বলবে এই কথাই চিন্তা করতে থাকে সুব্রত।

ওদের খাওয়ার মাঝখানেই বাড়িতে আসে শ্যামল আর অনাদি। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গিয়ে অনাদিকে ঘরে খাবার ঢাকা আছে সে কথা বলে মানসী। শ্যামলকেও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফুলদার ঘরে আসার কথা শুনে শ্যামল মানসীকে জোড় হাতে চুপ করতেই বলে। হাসতে হাসতেই আবার সুব্রতর পাশে বসে মানসী।

অনেকদিন পরে, দুজনে এভাবে পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে সুব্রত উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

ভুপতি ফেরেনি বোধহয়—

না—শ্যামল আর অনাদি এল।

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার, তুমি তাড়াতাড়ি সব পরিষ্কার করে বিছানাটা ঠিক করে দাও।

সুব্রতর কথায় হেসে ফেলে মানসী। ওর খাওয়াও হয়ে এসেছে। এঁটো বাসন গুছিয়ে রান্নাঘরে রেখে একেবারে হাত মুখ ধুয়ে আসে মানসী। ঘরের এঁটো জায়গাটাও পরিষ্কার করে। সুব্রত বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। বিছানাটা ঝেড়ে ভাল করে পেতে দেয়। সুব্রত বিছানায় উঠে বসে।

নিজেকে যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন করে সুব্রতর পাশে এসে বসে মানসী। এতক্ষণে সম্পূর্ণ শান্ত হয়েছে মানসীর মন। সুব্রত বেশ বুঝতে পারে এই মুহূর্তে অনেক কিছু কথা মানসীকে বলা যায়। রাত্রির সুপ্তির মধ্যে পরম তৃপ্তির মত মানসীর মনের পরিধিতে প্রশান্ত এক শান্তি ফিরে এসেছে।

সংসারের এক চরম সুখস্বপ্নের ছবি মনে আঁকতে আঁকতে সুব্রতর পাশে শুয়ে পড়ে মানসী। এখন মানসীও সব্রতকে অনেক কথা বলে যাবে। রাঙ্গা মাসীমা ভুপতির মেয়ে দেখে যা যা বলেছেন সে-সব কথা থেকে শুরু করে আজ সকালে সুব্রতর সঙ্গে যা উত্তেজিত কথা বলেছে সে সব আবার বলবে মানসী। আর সুব্রতকেও সে সব কথা শুনে মানসীর কথায় সায় দিতে হবে।

অবশ্য এই মেয়েটির উপর তাই রাগ করেও থাকা যায় না। নিরন্তর এই একই নাটকের মহড়া দিয়ে চলেছে সুব্রত। এই বোধ হয় নিয়ম। এরই নাম তো সংসার। নীড় ছেড়ে যে পাখিরা সকালের আলোয় ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে ছিল—তারা সব আবার নীড়ে ফিরে নতুন আলোর আশায় অপেক্ষা করছে। সবাইকেই তাই করতে হয়।

মানসীর শরীর থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। অনেক কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও এখন কিছু বলতে ভালও লাগে না সুব্রতর। মুখ নীচু করে মানসীর কপালে আলতো করে একটু চুমু খায় শুধু। বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করে মানসী। ঘরের মৃদু নীল আলোয় মানসীকে আজ ভীষণ ভাল লাগছে। তাই এখন আর কথা না বলে' নিবিড়ভাবে মানসীকে কাছে এনে নতুন এক জীবনের ছন্দই রচনা করতে চাইল সুব্রত।

ভোর রাত্রিতে সামান্য বৃষ্টি হল। ক'দিন থেকেই বেশ একটু গুমোট ভাব ছিল। শীতের আমেজে বৃষ্টিটুকু ভালই লাগছিল। ঘুম ভেঙে গেলেও তাই উঠতে ইচ্ছে করছিল না মানসীর। আজ তো ছুটির দিন। সওদাগরী অফিসের এখন এই একটা ভাল জিনিস হয়েছে। শনিবার আর রবিবার পরপর দু'দিন ছুটি! কাল তো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে দিনটা বিশ্রীভাবে কেটেছে। আজ সুব্রতকে কোনও ব্যাপারেই কথা বলবে না মানসী। মনে মনে ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েই পাশ ফিরে শোয়।

সুব্রতর একটা হাত ওকে জড়িয়ে রয়েছে। মুখে ফুটে রয়েছে তৃপ্তির আভা। কিছুক্ষণ সুব্রতর ঘুমন্ত মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে মানসী। এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। লোকটা তো সারাদিন এই সংসারের সবার কথা ভেবেই বাইরে পরিশ্রম করে। অথচ কেন যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না মানসী! সব বুঝেও কেন যেন সেই সময়গুলোতে ভীষণভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। এই সময়গুলোতে প্রায়ই মানসী ভাবে কিছুতেই আর সুব্রতর অবাধ্য হবে না। আর মনে মনে শুধু ভাবাই নয় ভাবনার ছবিগুলোকে বাস্তবে আঁকতে চেষ্টাও করে। কিন্তু হঠাৎই কতগুলো ঠুনকো কথা মনে এসে সমস্ত পরিকল্পনাটাই নষ্ট করে দেয়। এলোমেলো হয়ে যায় সুষ্ঠ সংহত ভাবনাগুলো।

কাল ঘুমুতেও অনেক রাত হয়েছে। মান-অভিমানের পালা মিটে যাবার পর সুব্রতর নিবিড় স্পর্শে নিজেকে বিলীন করে পরম তৃপ্তিই পেয়েছে মানসী। মানসীকে সহজভাবে কাল রাত্রেই জবার সব কথাও বলেছে সুব্রত। এটা যে সত্যিই কোনও অন্যায় নয় বরং একটি অসহায়া মেয়ের সামনে চলার পথে পরম

সহায়ক, সেটুকু বুঝে বার বার লজ্জায় সুব্রতর বুকেই মুখ লুকিয়েছে মানসী। সুব্রতকে ভুল বুঝে যে সব কথার আঘাত দিয়েছে তার জন্যও অনুশোচনায় ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিল মন।

ভূপাতর কথাও সব বলেছে সুব্রত। এমন কি ও যে তানিমাকে বিয়ে করে ঘরে আনতে পারে এমন আভাষও দিয়েছে। এদিকে রাঙ্গামাসিমা তো দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। সুব্রতর কাছে ভূপাতর কথা শোনার পর থেকেই মানসীর ভীষণ খারাপ লাগছিল। কি ভাবে যে রাঙ্গামাসিমাকে বোঝানো যাবে এসব! সুব্রত কিন্তু বলেই খালাস, সব দায় ঝাক্ক এখন মানসীর।

বিরাট একটা চিন্তার স্রোত মানসীর মাথার মধ্যে বইতে থাকে। এবার বোধ হয় সত্যি এতদিনের এই সাজানো সংসারটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিছুতেই আর সে ভাঙ্গনকে প্রতিরোধ করা যাবে না। একবার ভালকরে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে শাড়টা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নেয় মানসী। লেপের ওয়ারটা ছিঁড়ে গেছে। সুব্রতর পা আবার সেই ছেঁড়া ওয়ারের মধ্যে ঢুকে আছে। লেপটা টেনে ভাল করে সুব্রতর গায়ে দিয়ে দিল মানসী।

বাইরে ভোরের পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। একটা কাক অনেকক্ষণ থেকে সামনের জানালায় বসে ডাকছে। কানে বিশ্রী লাগছে ওই কা-কা ডাক। কিন্তু উঠতেও ইচ্ছে করছে না। সুব্রত একবার চোখ মেলে তাকাল। আর শুয়ে থাকা ঠিক হবে না। কাজের লোক আসবে। তাছাড়া রাঙ্গামাসিমা উঠে পড়লে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাবে মানসী। মেসোমশাইর শরীরটাও ভাল নেই। কাল অতখানি রাস্তা যাতায়াতে শরীরের ওপর ধকল গেছে বেশ। তাই মানসী শাড়ি ঠিক করে উঠতেই চায় কিন্তু সুব্রত ওর হাত ধরে বুকের-সামনে টেনে নেয়।

বাধা দিতে গিয়েও পারে না মানসী। সুব্রতর বুকে মুখ ঘষতে থাকে। ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সুব্রত কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু হঠাৎ বাইরে শ্যামলের গলার শব্দে তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানায় সোজা হয়ে বসে মানসী। সুব্রতও গায়ে লেপ জড়িয়ে উঠে বসে। বাইরে শ্যামলের গলার আওয়াজ এবার স্পষ্টই শুনতে পায় ওরা। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলছে শ্যামল, বৌদি ভাই ফুলদাকে একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দাও না।

দরজার ওপর একটু মৃদু ধাক্কাও দিচ্ছে শ্যামল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই উদভ্রান্তের মত ঘরে ঢোকে। সুব্রতও বিছানায় উঠে বসেছে। শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করে, কি রে কি ব্যাপার? এত সকালে তুই ঘুম থেকে উঠেছিস!

একটু বাইরে এসো ফুলদা কথা আছে। মানসীর দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নীচু করে বলে শ্যামল।

অবাক বিস্ময়ে শ্যামলের দিকেই তাকিয়ে থাকে মানসী। শুধু ভাবে যে ছেলেটা মানসীর সঙ্গ ছাড়া বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না সেই ছেলে আজ তার ফুলদার সঙ্গে বিশেষ এক গোপনীয় কথা বলতে এসেছে এই কাক ডাকা ভোরে। মানসীর চিন্তার মধ্যেই সুব্রত উঠে শ্যামলকে নিয়ে বাইরে আসে। ওদের পিছনে মানসীও হাঁটে। বারান্দায় অস্থির ভাবে পায়চারী করছে অনাদি। অনাদির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এবারে অজানা একটা ভয় এসে গ্রাস করে মানসীকে। বুকটা কাঁপতে থাকে।

বারান্দার পাশের ঘরেই অনাদি থাকে। শ্যামলকে নিয়ে ঘরে ঢোকে সুব্রত। অনাদিও ওদের সঙ্গেই যায়। মানসী পায়ে পায়ে দরজায় কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। একবার মানসীকে দেখে কি যেন বলতে চায় সুব্রত। কিন্তু ওকে কিছু না বলে শ্যামলকেই চাপাস্বরে কিছু ব'ল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও শ্যামল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। স্থানুর মত বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ভীষণ অপমানিতা বোধ করে মানসী। অনেকগুলো ভয়ের ভাবনার সঙ্গে সুব্রতকে জড়িয়েও একটা ভয়ের মুখোস মানসীর মনের আয়নায় ভাসতে থাকে।

মানসী বেশ বুঝতে পারে এ বাড়ির চরম একটা দুঃসময় হয়ত ঘনিয়ে এসেছে। রূঢ় বাস্তবের বঞ্চনায় হয়ত আজ এ বাড়ির প্রতিটি মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আচ্ছা সবাই তো রয়েছে ভূপতি কোথায় গেল ? হঠাৎই এলোমেলো চিন্তার স্রোতের মধ্যে ভূপতির কথা মনে এল। প্রথমে মানসী ভেবেছিল মেসোমশাইর কিছু হয়েছে। কিন্তু ওরা যখন চুপচাপ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তখন ভূপতির কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল মনে।

রাঙ্গামাসিমা এখনও নীচে নামেন নি। হয়ত বিছানায় শুয়েই ঠাকুরের নাম জপ করছেন। বাইরের দরজাটা খুলে দিয়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল মানসী। ভারি এসে জল ভরা শুরু করেছে। কাজের লোকও আর একটু পড়েই আসবে। আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। তবুও মনের মধ্যে তোলপাড় করা সেই রহস্যের কোনও কিনারাই তো হল না। তাই মানসী চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। মনে মনে শুধু সুব্রতর উপরই রাগ হয়। প্রতিটি কাজেই তো মানসীকে আসল সময়ে প্রয়োজন হয়। হয়ত এই মুহূর্তে যে চরম নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে ওরা দরজা বন্ধ করেছে তার শেষ যবনিকা টানার সময়ও মানসীর ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় হবে না। তবুও আসল ঘটনার সময় মানসীর প্রবেশ নিষেধ।

সুব্রতকে মনে মনে গালাগাল দিয়েই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় মানসী।

অগোছাল বিছানাটা গুছিয়ে ঠিক করে রাখে। লেপের ওয়ারটা আজ ঠিক করতেই হবে। রাঙামাসিমাকে বললেই করে দেবেন সেলাই। কিন্তু সে সব তো পরের কথা। এখন ও ঘরে যে কিসের নাটক চলেছে সেটা জানতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

বেলা হয়ে যাচ্ছে। চা করতে হবে। রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও আবার ঘুরে ওরা যে ঘরে রয়েছে সেইখানে এসেই দাঁড়ায় মানসী। বাইরে থেকে ভেতরের খবর বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। শুধু কিছু চাপা কথার শব্দের সঙ্গে শ্যামলের উত্তেজিত কয়েকটা কথার টুকরো বাইরে ভেসে আসে। মানসী কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। রাঙামাসীমাকে গিয়ে ডেকে আনার কথাও একবার মনে হয়েছে। চিন্তার মধ্যেই ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরল ওরা। প্রথমে সুব্রত তারপর অনাদি আর শ্যামল। দরজার সামনেই মানসীকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে সুব্রত হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর মানসীকে লক্ষ্য করেই বলে, কি ব্যাপার তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো? চা হয়েছে?

সুব্রতর কথা শুনে রাগে ফুঁসতে থাকে মানসী। সব জেনে আর বুঝেও শুধু শুধু লোকটা সবার সামনে হেনস্থা করবে। কচি খোকা যেন কিছুই জানেন না। কেন যে মানসী এখানে রয়েছে সেটা যেন সুব্রত কিছুই বুঝতে পারে নি! বেশ কড়া একটা জবাবই জিভের ডগায় এসেছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে শ্যামলের গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী বলে, তুমিও তাহলে গম্ভীর হতে পার! এরপর আমার সঙ্গে পাকামি করতে এলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বুঝেছ। আব্দারের বেলায় বৌদিভাই আর গভীর গোপন সব কথার বেলায় শুধু ফুলদা?

মানসীর কথায় হেসে ওঠে শ্যামল। অনাদি আর সুব্রতও সে হাসিতে যোগ দেয়। কিন্তু সে হাসি মুখে থাকতেই পিছন ফিরে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় মানসী। চা এখন সত্যিই সবারই প্রয়োজন। রান্নাঘর থেকেই মানসী দেখল অনাদিকে নিয়ে সুব্রত আবার ঘরে ঢুকল। শ্যামল সুব্রতকে কি যেন বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কেটলিতে জল ফুটছে। আর একটু দেরী হলেই স্টোভে গড়িয়ে পড়ত। চা পাতা দিয়ে কেটলি নামায় মানসী। কাপ আর গ্লাস গুছিয়ে নেয়। অশুভ চিন্তার ছায়াগুলো মন থেকে কিছুতেই দূরে সরছে না। অথচ চিন্তা করে কোনও সমাধানই করতে পারছে না মানসী। বার বার সব কিছু চিন্তার সঙ্গে সুব্রতর কথাই প্রথমে মনে আসছে। অন্ততঃ সুব্রত যেন জড়িয়ে না পড়ে কোনও অহেতুক যন্ত্রণার মধ্যে। মন থেকে একরকম জোর করেই চিন্তার বেড়াজাল গুলো সরিয়ে রাখে মানসী। চায়ের কেটলি আর কাপ ডিস গ্লাস ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে ঘরের দিকেই পা বাড়ায়।

এতক্ষণ বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছিল সুব্রত আর অনাদি। মানসীকে দেখেই অনাদি পুরনো খবরের কাগজটা টেনে নেয় সামনে। সুব্রতও টেবিলে কি যেন খুঁজতে থাকে। এবারে আর চুপ করে থাকতে পারে না মানসী। কাপে চা ঢেলে সুব্রতকে টেবিলের দিকে এগিয়ে দেয়। আর এককাপ চা অনাদির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে,

আচ্ছা কি ব্যাপার বল তো? তখন থেকে দেখছি সবাই এক সঙ্গে বসে কি সব আলোচনা করছ? ঘরের দরজা বন্ধ করেও বেশ কিছুক্ষণ কাটালে। আবার শ্যামল চা না খেয়েই কোথায় যেন গেল। তোমরা সবাই যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছ সে কথা আমার জানতে কি সত্যিই কোনও দোষ আছে? নাকি আমি এ বাড়ির ভাল মন্দের অংশীদার নই!

মানসীর একটানা কথা শুনে প্রথমে কিছুই বলতে পারে না অনাদি। সুব্রত নিরবে চায়ে চুমুক দিতে থাকে। চায়ের কাপ টেবিলে রেখে অনাদি বলে, ভুল বুঝো না বৌদি। যা ঘটেছে সেটা এমনই একটা নিদারুণ ঘটনা যেটা আমরাই এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ সে ঘটনা সত্যি এবং রূঢ় বাস্তব। আর সেই চরম নাটকীয় ঘটনাটা মা বাবা কি ভাবে গ্রহণ করবেন, আমাদের এই ঘরের দরজা বন্ধ করে আলোচনার বিষয়বস্তু সেইটাই।

আঃ অনাদি তুই একটু চুপ কর তো। ধমকের সুরেই অনাদিকে থামায় সুব্রত। এতক্ষণে মানসী দেখতে পায় সুব্রতর হাতে একটা চিঠি রয়েছে। হয়ত তখন টেবিলে এই চিঠিটাই রাখছিল। মানসী এগিয়ে এসে চিঠিটা হাত দিতেই সরে দাঁড়ায় সুব্রত। মানসীরও জেদ বাড়ে। আবার এগিয়ে যায় সুব্রতর দিকে। অনাদির উপস্থিতিতে এসব বাড়াবাড়ি সুব্রতর সত্যি ভাল লাগে না। চিঠিটা বুক পকেটে রেখে মানসীকে বলে, কি ছেলেমানুষী শুরু করলে?

ছেলেমানুষী আবার কি? তোমরা যে সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তায় রয়েছ, সেটা আমি দেখলে ক্ষতি কিসের?

ক্ষতির কথা নয়। তোমাকে তো সব বলতেই হবে, আর শুনবেও তুমি সব—তবে--

তবে—কি?

ভাবছি, কথাটা তোমাকে দিয়েই রাঙামাকে বলালে ঠিক হবে কি না। মানে রাঙামা আবার তোমাকে ভুল না বুঝে বসেন।

সুব্রতর এবারের কথা শুনে চমকে পিছিয়ে আসে মানসী। সত্যিই তো সুব্রত যেভাবে মানসীর কথা চিন্তা করেছে ও নিজেই তো সে কথা মনে আনতে পারেনি। এমনি রাঙামা কথায় কথায় মানসীকে বিরূপ সমালোচনা

করেন। আবার ছেলেদের কোনও দোষের কথা যদি মানসী বলতে যায় তাহলে তার মধ্যেও ওকে জড়িয়ে পড়তে হবে।

সুব্রতর কথা শুনে তাই সব জানবার কৌতুহলটুকু আর ততখানি নাড়া দেয় না মনে। তবুও ওটা কার চিঠি সেটা জানতেই হবে। মুখ তুলে তাকাতেই হাতের চিঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে সুব্রত বলে, নাও পড়ে দেখ।

মনের মধ্যে যে কালো মেঘটা একটু একটু করে বড় হচ্ছিল, সুব্রতর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে খুলে চোখ রাখতেই সেই কালো মেঘটা এবারে স্পষ্ট হয়ে সামনে এল। বাইরের মেঘলা আকাশটার মতই থম থম করছে অনাদির মুখ। চিঠির শেষে চোখ রেখেই আবার চমকে ওঠে মানসী। সব ভাবনারও হয় শেষ।

ভূপতিই চিঠি লিখেছে সুব্রতকে। ঝড়ের পূর্বাভাষই শুধু নয়—কাল বৈশাখীর ঝড়ে বা প্রলয়ংকরী বন্যায় বিধ্বস্ত জীবনের ছবিগুলোই যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে ভূপতির এই চিঠির মধ্যে। একবার সুব্রত আর অনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে খাটের কাছে সরে এসে দাঁড়াল মানসী। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে চিঠিটা ভাল করে পড়তে লাগল ঃ

শ্রীচরণেষু

ফুলদা,

মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করেই শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। অনেক মুখের ভিড়ের মধ্যে প্রথমেই তোমার মুখ মনে পড়ায় তোমার কাছে অকপটে সব কিছু জানানোও প্রয়োজন বোধ করলাম। কারণ আমার বর্তমান জীবনের পটভূমি তোমার অজানা নয়। তোমার আর বৌদির কাছে লুকিয়ে রেখে জীবন এগিয়ে নিয়ে যাবার মত মানসিকতাও আমার নেই। তাছাড়া শুধু আমার চরম পরিস্থিতির জন্য তোমাদের সবার পারিবারিক শান্তি মুছে যাক এও আমি চাই না। আর তা চাই না বলেই এই পথ বেছে নিলাম।

তনিমার কথা তোমাকে আমি সব বলেছি। ওদের বাড়ির দিক থেকে কোনও বিধি নিষেধের গন্ডি নেই। তবে প্রথমটায় আমি নিজেই সংস্কার মুক্ত হতে পারিনি। দারুণভাবে আঘাত করেছিল—বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তনিমার আগের জীবনের ওই ছেলেটা। কিন্তু মনের সঙ্গে চরম বোঝাপাড়া করেই আমি অবচেতন মনের সম্মতি পেয়েছি। ফুলের মত নিষ্পাপ ওই কচি শিশুটার তো সত্যি কোনও দোষ নেই। ও তো অসহায়। বলতে গেলে কাদার তাল। যেমন খুশী গড়ে নেয়া যাবে। বাধা তো ওর দিকে কিছুই থাকবে না। বরং প্রশ্রয়ের আশ্রয়ে ওর আগামী ভবিষৎ হয়ত সুখীই হতে পারে।

মনের পরিধিতে তাই তনিমাকে গ্রহণ করতে আর কোনও বাধা নেই আমার। মা-বাবা তুমি এমন কি বৌদিও বহুবার আমাকে ঘর বাঁধার কথা বলেছো। কিন্তু

ফুলদা, তোমাদের দেয়া সুখের নীড়ে বাসা বাঁধা হয়ত আমার কপালে নেই। এটা হয়ত তোমাদের ভাষায় একটা প্রহসনই করলাম। কিন্তু সত্যি তুমি বিশ্বাস কর, এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। তনিমার ওই জীবন চোখে দেখা যায় না। আমার ভীরুমনও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তাই ওদের সবাইকে জানিয়েই তোমার কাছে সব জানালাম।

মাকে তো তুমি জান। তিনি অন্ততঃ কিছুতেই আমাদের এই বিয়েতে মত দেবেন না। তনিমার সঙ্গে ওর ছেলের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই ওকে আমি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ঠিকও হয়েছে সব। নোটিশ আগেই দেওয়া ছিল আজই রেজিষ্ট্রি করব। আমার ঘনিষ্টতম কয়েকজন বন্ধু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তনিমার দাদাও রয়েছেন। বন্ধুদের চেষ্টাতেই বাগবাজারে একটা বাসা ঠিক করেছি। ভেবে দেখলাম, এই ঘটনার পর আর এ বাড়িতে থাকা চলে না। তাই নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপ ভাড়াটে বাড়িতেই পড়বে।

আশা করি তুমি ও বৌদি অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝবে না। দুঃস্বপ্নও তো মানুষই দেখে। খুব একটা অসহ্য মনে হলে ভাববে, ভূপতি নামে ছেলেটার সঙ্গে কয়েক বছরের মেলামেশাটাই একটা দুঃস্বপ্ন। শ্যামলের সঙ্গে হয়ত দেখা হয়ে যাবেই। পরিবেশ ঝিমিয়ে এলে ওকেই ঠিকানা জানাব। শেষ অনুরোধ মার দিকটা তুমি যা ভাল মনে কর সেই ভাবে ম্যানেজ করো। আর অহেতুক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করে নিজেদের বিব্রত করো না।

প্রণাম নিও।
ইতি—
ভূপতি।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারে না মানসী। পাথরের মূর্তির মত খাটের কোণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে উঠেছে। সুব্রত চেয়ারে বসে পেন খুলে কি যেন লিখছে। পুরানো কাগজটা বার বার ভাঁজ করে টেবিলেই রেখে দেয় অনাদি।

পায়ে পায়ে সুব্রতর কাছে এগিয়ে আসে মানসী। অনাদি সুব্রতর সামনে এসে বলে, আমি তাহলে চলি ফুলদা, একটা জরুরী মিটিং রয়েছে বাজার কমিটির। আর আমার কথা তো তোমাকেই বললাম। যদি তুমি বল তাহলে অবশ্যি আমাকে খোঁজ নিতেই হবে। কিন্তু আমার এ সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতেও ভাল লাগছে না আর।

কথাগুলো বলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনাদি। মানসী সুব্রতর সামনে চিঠিটা রেখে একটু ঝুঁকে বলে, এখন তাহলে কি হবে ?

তাই তো ভাবছি।

শুধু ভেবেই যাচ্ছ—নাকি সমাধানও করেছ কিছু? রাঙ্গামাসিমাকে কথাটা তো বলতেই হবে তাই অন্যকিছু না ভেবে তাঁর কথাটাই ভাবনায় আন। মানসী বেশ বিজ্ঞের মত তাকায় সুব্রতর দিকে। মানসীর একটা হাত ধরে সুব্রত বলে, সেই ভাবনাটুকুর জন্যই তো তোমাকে সব বললাম।

ওমা, আমাকে আবার সব বললে কখন! সকাল থেকে তো শুধু তাড়িয়েই বেড়াচ্ছ। সুব্রতর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটু সরে দাঁড়ায় মানসী। এরকম একটা গভীর সমস্যাতেও শুধু ছেলেমানুষী করে যাচ্ছে। সুব্রতর সত্যি খুব খারাপ লাগছিল। মাথার মধ্যে শিরাগুলোর দপদপানিও শুরু হয়েছে এই সকাল বেলায়! ভাল করে চাটুকু পর্যন্ত খেতে পারে নি।

রাঙ্গামার সমস্যাটা সত্যি ভয়াবহ। মানসীর কথা মনে এলেও সেটা ঠিক ভাল হবে না। ভূপতির চিঠিটা আবার খুলে একবার চোখ বুলিয়েই আবার ভাঁজ করে রেখে দেয়। মানসীর দুষ্টুমি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কি যে অবুঝ মেয়ের মত সব সময় কথা বলো তার ঠিক নেই। বয়েস তো হচ্ছে এখন একটু ভারিক্কি হওয়ার চেষ্টা কর। সমস্যাটা কি ভাবে রাঙ্গামাকে জানানো যায় তারই চিন্তা কর বুঝলে।

মানসী হাসতে গিয়েও চেপে যায়। তারপর সত্যিই গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা ঠাকুরপোর এই চিঠিটা প্রথম কে দেখল বলত? তাছাড়া অত ভোরে সে গেলই বা কোথায়?

কি জানি, ভাল করে তো কিছুই বুঝতে পারলাম না ওদের কথায়। তবে অনাদি বলল, ভোরের দিকে বাইরে যাবার সময় ও দেখে পাশের খাটে ভূপতি নেই। ঘুরে এসেও কিছু সময় পেরিয়ে যাবার পরও যখন এল না তখনই কেমন সন্দেহ হয় ওর। দু'জনে তো কথাও বেশী হত না। এক ওই শুধু রাত্রে শোবার সময় যা সামান্য একটু আলাপ। তা' সন্দেহ হতেই ও ভূপতির বিছানার কাছে এসে বালিশের পাশে চিঠিটা দেখতে পায়। বাইরে তখন ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টিও হচ্ছিল। হয়ত ফার্ষ্ট ট্রেনেই চলে গেছে।

তারপর। সুব্রত থামতেই বড় বড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মানসী। সুব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তারপর আর কি—অনাদি তখন শ্যামলকে ঘুম থেকে তুলে আমাকে ডাকতে পাঠায়।

তা হলে শ্যামল এখন কোথায় গেল?

কোথায় আবার যাবে। ও তো তোমার মতই। কথা শোনে কারও। চিঠির সব ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝেই ছুটল বাইরে। ওর ধারণা, ভূপতির এখানকার বন্ধুদের কেউ হয়ত কোনও সন্ধান দিতে পারবে। তাই বাজার পাড়ার দিকে গেল।

তা তুমি নিজে যে এতক্ষণ হল সমস্যাটা নিয়ে ভাবছ—সমাধান পেয়েছ কিছু?

কিসের সমাধান ?

ওই, রাঙ্গামাকেই আগে ঘটনাটা জানাবে নাকি ঠাকুরপোর খোঁজ করতে কলকাতায় বেরবে। সুব্রতর মাথার চুলে আঙ্গুল বোলাতে থাকে মানসী। পিছন থেকে মানসীর হাত ধরে সুব্রত বলে, না—কলকাতায় গিয়ে আমি কি করবো। খুঁজবোই বা কোথায় ! বাগবাজার তো আর একটুখানি জায়গা নয়। তাছাড়া টাকায় আজকাল সবই হয়। ভূপতি নিশ্চয়ই ওর বন্ধুদের দিয়ে সব কিছুই ঠিক করে রেখেছে। চিঠি তো পড়লেই। আজই রেজেস্ট্রি ওদের। তনিমাদের বাড়িতে খোঁজ পেলেও সেখানে আজই আমার যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া, এখন আর কোনও কথাতেই ভূপতিকে ফেরানো সম্ভব নয়।

তা হলে কি এখন চুপ করে ঘরে বসে থাকবে ?

বাজে বকো না। চুপ করে থাকব কেন। শ্যামল ফিরে আসুক। ওকে নিয়েই যা হোক কিছু করব। এখন যাও আর কথা না বলে দয়া করে আরও একটু চায়ের জল বসাও। যা তেতো পাটপাতার জল খাওয়ালে। কোনও কিছুই তো মন দিয়ে করছ না আজকাল। সকালে একবার একটু চা-ই বাড়িতে খাই তা সেটুকুও যা-তা করে করবে।

সুব্রতর কথা শুনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে মানসীর। কি করে যে লোকটা কথা শোনাবে দিন রাত শুধু সেই ভাবনা। একটা সময়ও ভালভাবে কাছে ডেকে কোনও বুদ্ধিপরামর্শ করে ! যখন শুধু চারদিকের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ার ভয় হয় তখন শুধু একবার মানসীর কথা মনে পড়ে যায়। অথচ মানসী ওর কথা ভেবেই সাড়া হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে চিন্তার মধ্যে চা পাতা একটু বেশী হয়েছিল। তাই বলে কি পাটপাতার তেতো জল হয়েছে ? কই অনাদিও তো চা খেয়ে গেল। সে তো বলতে পারত।

অনেক কথা শোনাতে ইচ্ছে হলেও কিছুই বলল না মানসী। এখন কথার জবাব দিতে গেলেই আবার হয়ত ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা বিশ্রী ঘটনার সৃষ্টি হবে। তাই একবার শুধু সুব্রতর মুখের দিকে অভিমান-ভরে তাকিয়ে নিজের ক্ষোভটুকু সামলে নেয় মানসী। তারপর দরজার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলে,

তাহলে যাতে সব কিছু ভাল হয় সেইসব ব্যবস্থা তোমরাই করো। আমাকে যেন আর কোনও কিছুতে ডাকাডাকি করো না।

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ায় না। রান্নাঘরের দিকেই যায়। রাঙ্গামাসিমা মেসোমশাই ওঁদের চাও দিতে হবে। সুব্রত কিছু বলতে যাচ্ছিল মানসীকে। কিন্তু প্রায় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল শ্যামল। মানসীর সঙ্গে একটু ধাক্কাও লেগে যায়। কোনও কথাই বলে না মানসী। ওপর থেকে মেসোমশাইর কাশির শব্দ শোনা

যাচ্ছে। রাঙ্গামাসিমাও হয়ত চা না পেয়ে এখুনি নীচে নেমে আসবেন। শ্যামল কি খবর নিয়ে এল সেটা জানতে ভীষণ ইচ্ছে হলেও ও ঘরে যায় না মানসী। রান্নাঘরের দরজাটাও ইচ্ছে করে ও অল্প বন্ধ করে রাখে। অনেক কিছু মান অভিমান দূরে সরিয়ে চা করতেই মন বসায়।

ঘরে ঢুকে সুব্রতর কাছেই এগিয়ে যায় শ্যামল। খাটের ওপর বসে সুব্রত তখনও ভূপতির চিঠিটা আবার পড়ছে। মুখ তুলে বলে, কিরে কিছু খবর পেলি ?

না—তবে হারু বলল, ও নাকি মেজদাকে খুব ভোরে স্টেশনের রাস্তায় যেতে দেখেছে। হাতে একটা এ্যাটাচিও ছিল।

হারু দেখল কি করে ?

বা রে, ওকে রাত চারটেয় উঠে উনুন জ্বালতে হয়। কারখানার লোকেরা সব চা খেতে আসে না। আজ বরং বৃষ্টির জন্য ওর একটু দেরীই হয়েছে উঠতে। মেজদাটা যে শেষপর্যন্ত এমন একটা কেলেংকারিয়াস কান্ড বাধাবে এ বাবা আমি ভাবতেই পারছি না। শেষ কথাটা বলেই জিভে কামড় খায় শ্যামল। ফুলদার সঙ্গে ও কখনো এ ভাবে কথা বলে না। এখন কেন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

সুব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলে শ্যামল। কথা শুনে সুব্রতরও হাসি পাচ্ছিল কিন্তু এখন তো আর হাসির সময় নয়। তাই দাদার মতই শ্যামলকে ধমক দিয়ে বলে,কি সব যা-তা বকছিস। এখন কি এই সব ঠাট্টা তামাসার সময়। রাঙ্গামাকে কথাটা কি ভাবে বলা যায় সেটা ভেবেছিস ?

মার কথা শুনেই দু'পা পিছিয়ে যায় শ্যামল। তারপর হাতজোর করে বলে, ওরে বাবা-দোহাই তোমার ফুলদা, আর যা করতে বল চোখ কান বুঁজে আদেশ পালন করব। কিন্তু ওই গ্রেট মাদারের কাছে আমাকে যেন এই বার্তা নিয়ে পাঠিও না। তা হলে আমার গর্দানটাই আগে কাটা যাবে। এ ব্যাপারটা ওই যে মেজদা লিখেছে না তুমি আর বৌদিভাই মিলেই ম্যানেজ করো। কিন্তু ফুলদা, আমি ভাবছি একটা অন্য কথা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে বসে সুব্রত বলে, কি কথা বল ?

সুব্রতর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে শ্যামল। হাসিখুশী উজ্জল মুখটা হঠাৎই যেন করুণ হয়ে ওঠে একটু। তবুও মুখের ভাব যথাসম্ভব ঢেকে ও বলে, না তেমন কিছু নয়। আমি শুধু ভাবছি, মা এই খবরটা সামলাবেন কি করে। তা ছাড়া কালই যে মা অমন একটা হাসির আর মিলনের ছবি বুকের মধ্যে গুছিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন। আজ সকালে উঠেই দেখবেন, সেই হাসি আর মিলনের ছবিগুলো কেমন সাদা হয়ে গেছে। কান্নার

লোনা জলে ছবিগুলোর সব রং ধুয়ে-মুছে গেছে। এ যেন ভাবাই যায় না—তাই না ফুলদা ?

কথাগুলো বলতে বলতে শ্যামলের গলাটাও ধরে আসে। সুব্রতও কিছু বলতে পারে না এরপর। অবাক বিস্ময়ে সবার ছোট এই ভাইটির মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে শুধু। কথা শেষ করে পা দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে থাকে শ্যামল। সুব্রত ভাবে, কত গভীর উপলব্ধি নিয়েই ভূপতির ব্যাপারটা চিন্তা করেছে শ্যামল।

রাঙ্গামাসিমার এই দিকটা এতক্ষণ সুব্রতর চিন্তাতেও আসে নি। অথচ রাত্রে শুয়ে মানসীর কাছেই শুনেছে, রাঙ্গামা ভূপতির বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। এই রকম অবস্থায় এ রকম একটা আঘাতের ছবি তার সামনে তুলে ধরলে তিনি সহ্য করতে পারবেন কি-না সেইটাই আগে ভাববার কথা। তা ছাড়া মেসোমশাই অসুস্থ। পারিবারিক সম্মানের দিক ছাড়াও মেসোমশাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা। এ খবরে তাঁরই বা কতখানি লাগতে পারে সে কথাও চিন্তা করতে হবে। যদিও মেসোমশাই এখন আর ছেলেদের কোনও ব্যাপারেই কথা বলেন না। তবুও এটা যে তাঁর একেবারে আত্মার আত্মীয়তার ব্যাপার। শ্যামলের কথা শুনে একসঙ্গে এলোপাথারি চিন্তার জট মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে নীচে নামে সুব্রত। কয়েকবার অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। বার বার শুধু রাঙ্গামাসিমার মুখের ছবিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শেষে সুব্রত ঠিক করে যা হয় হোক—কথাটা রাঙ্গামাকে জানানো প্রয়োজন এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয়। না হলে হয়ত, অনেক কথার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে সুব্রত আর মানসীকে। হয়ত বা মানসীকে ভুল বুঝে, রাঙ্গামা এই ঘটনার সঙ্গে নিছক একটা মনগড়া কাহিনী তৈরী করে নিয়ে ওকে আরও আঘাত দেবেন। তাই রাঙ্গামাকে লুকিয়ে ভূপতির এই ব্যাপারে কোনও সমাধানে আসা কিছুতেই ঠিক হবে না। হাজার হোক ছেলে তো। শত অপরাধ করলেও ক্ষমা পাবেই। বরং মানসী আর সুব্রতই চিরদিনের মত অপরাধী হয়ে থাকবে। মনে মনে তাই রাঙ্গামাকে জানানোর সংকল্পটাই ধরে রাখে সুব্রত।

চিন্তার মধ্যেই চায়ের জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ঢোকে মানসী। শ্যামল ওর দিকে এগিয়ে যেতেই মেঝেতে বসে পড়ে মানসী। কিছু একটা বুঝে শ্যামল টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। দু'কাপ চা দু'জনার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বাইরেই পা বাড়ায় মানসী। সুব্রত ওর দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলে। এখন আবার কোথায় যাচ্ছ !

রাঙ্গামা আর মেসোমশাইকে চা দিতে।

না যেও না। রাঙ্গামাকেই বরং নীচে নামতে দাও।

সুব্রতর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে তাকায় মানসী। ওর সে চোখের ভাষা পড়ে সুব্রতই আবার বলে, রাঙ্গামা নীচে এলেই কথাটা তাঁকে বলতে হবে। ভয় নেই, আমিই সব বলব। তুমি আর শ্যামল শুধু আমার কাছে থাকবে। অনাদি তো পালাল। বড় যখন হয়েছি দায়িত্বগুলো সব তো একা আমাকেই পালন করতে হবে।

ঝড়ের পূর্বাভাষই শুধু নয়; সুব্রতর গম্ভীর কথা শুনে মানসী বুঝতে পারে ঝড় শুরু হয়েছে সুব্রতর অন্তরে। কোনও চিন্তার শক্তিও যেন আর নেই। সব কিছু হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ওরা সবাই। এখন শুধু রাঙ্গামার কাছে আসার প্রতীক্ষা। মনে মনেই মানসী তখনকার ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করে। রাঙ্গামাসিমা কিছুতেই এই রকম একটা অন্যায়কে সহজভাবে মেনে নেবেন না। আর তা না নিয়েই সমস্ত রাগের বোঝা মানসীর ওপর চাপাবেন। এমনিতেই তো ভূপতিকে জড়িয়ে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হয়। তবে আজ মানসীও ঠিক করেছে, রাঙ্গামাসিমার কোনও অন্যায় কথাকেই আর চুপ করে মেনে নেবে না। তাতে যা হয় হবে।

ভূপতির এই পঙ্কিল জীবন কাহিনীর মধ্যে দিয়েই যদি মানসীর নতুন জীবন শুরু হয়, তবে হোক। সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়াই ভাল। এ ভাবে আর সত্যিই থাকা যাচ্ছে না। একটা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় ওরা তিনজন এরপর আর একটাও কথা না বলে চুপ করে যায়। শ্যামল কয়েকবার মানসীকে কিছু বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানসীর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে ঠিক এই মুহূর্তে কোনও অন্যপ্রসঙ্গ তুলতেও ভয় করল ওর। নীরবে টেবিল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা তুলে পাতা ওল্টাতে থাকে শুধু। সুব্রতর সমস্ত মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে। ভূপতির চিঠিটা শক্তমুঠিতে ধরে সুব্রত সামনের দরজায় চোখ রেখেছে। রাঙ্গামাসিমার আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনেই যেন চলেছে ওরা তিনজন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনাদি প্রথমে বাজার কমিটির অফিসের দিকেই যাচ্ছিল। মনের মধ্যে ভূপতির ঘটনাটা তোলপাড় শুরু করেছে। কিছুতেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না। যাবেই বা কি করে? এ রকম একটা ঘটনায় যে ওদের পরিবারের সবাইকে জড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা অনাদি কল্পনাতেও আনতে পারছে না। অসবর্ণ বিবাহের কিছু মধ্যস্থতা ওকেও করতে হয়েছে। কিন্তু সে সব তো অন্য ঘটনা। এ যে একেবারে নিজস্ব গণ্ডিতে প্রহসন। ভূপতির সঙ্গে তনিমাকে নিয়ে কিছু কথা অনাদিও জানত। তবে তখন ওসব ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত কিছু হয় নি। বাড়ির পাশে বা সামনে ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে ওরকম

অনেক কিছুই ভালবাসার খেলা খেলে। তারপর সময়ের মাপকাঠিতে বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে এলে সবাই ছেলেমানুষীগুলো বুঝতে পারে।

তাছাড়া তখন কথাগুলো কানে এলেও দাদাদের কোনও ব্যাপারে নিজেকে কোনও দিনই জড়াতে চায় নি অনাদি। অনেকটা নিজস্ব পরিমণ্ডলেই চলাফেরা করত ও। ওদের থেকে নিজেকে সব সময়ই স্বতন্ত্র ভেবে এসেছে। চিন্তাধারার মধ্যেও অমিল অনেক। তাই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্যেই জীবনের স্বার্থকতা খুঁজতে চেষ্টা করেছে অনাদি। বাবার সঙ্গেও এই নিয়ে বহুবার মতান্তর হয়েছে। তা সে সব কথায় অনাদির কিছু এসে যায় না। যেটা ও নিজে ধ্রুব বলে ভেবেছে, যে সব চিন্তাধারা আজকের পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চিরন্তন সুস্থতার আদর্শকেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এসেছে অনাদি।

কিন্তু ঠুনকো একটা সেণ্টিমেণ্টের মোহে ভূপতি যে এমন একটা কাজ করে বসবে, সেটা অনাদির সংস্কারমুক্ত মনও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তাই বার বার চিন্তার ঝড়টা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তাছাড়া সুব্রত আর মানসীর মধ্যেও ইদানিং যে সব ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে সে সব ঘটনাও অনাদি কিছু কিছু শ্যামলের মুখে শুনেছে। ওদের দু'জনার সম্পর্কটাও যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই একটা চিন্তাও কিছুদিন হল ওনাদির মনে ছায়া ফেলেছে। যদিও এসব চিন্তার ছবি কোনও দিনই ও বুঝতে দেয়নি বাড়িতে। কারণ বাড়িতে অনাদির একটা বিশেষ পরিচয় আছে। সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকাও একটা কারণ।

আজকের মিটিংটা সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল। আসন্ন মিউনিসিপালিটি ইলেক্শানে সদস্য মনোনয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনার কথা ছিল। আর এই মিটিং-এ অনাদির একটা বড় ভূমিকাও ছিল। অথচ আজই সকালে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

রাস্তায় চলতে চলতেই অনাদি ভাবল, মনের এই অসমতা নিয়ে কোনও কথাই আজ মিটিং-এ গুছিয়ে বলতে পারবে না ও। আর তার ফলে হয়ত অন্য সবার কাছে কিছুটা উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতে হবে। তাই অন্তরের সমস্ত ইচ্ছেটাকে একরকম জোর করে মন থেকে দূরে সরিয়ে স্টেশনের রাস্তায় ঘুরল অনাদি। ঠিক করল শুভব্রতর কাছে যাবে। বাড়ির দিকটা ফুলদা যা হোক ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।

মার সামনে এখন থাকা মানেই আর একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সামনে পড়া। হয়ত মানসী আর মা দু'জনাই এমন সব কথা শুরু করবে যাতে ভূপতির ঘটনাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। মা'র কথাটা চিন্তা করেই শুভব্রতর কাছে যাওয়া ঠিক করল অনাদি। এই রকম চরম পরিস্থিতিতে

শুভব্রতর পরামর্শ হয়ত অনেকখানি সহায়ক হতে পারে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে শুভব্রতকে সঙ্গে নিয়েই বাড়িতে ফিরবে।

অনাদির দীক্ষাগুরুই বলা চলে শুভব্রতকে। যদিও বয়সে অনেক বড়। তবুও কলকাতায় থাকার সময়ই শুভব্রতর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নিজের বলতে কেউই নেই। এক বুড়ো জ্যাঠামশাই শুধু কাশীতে থাকেন। বি-এ পাশ করার পর বস্তী উন্নয়নের কাজেই নিজেকে সমর্পণ করেছে শুভব্রত। অনাদির সঙ্গে এই রকমের সমাজ সংস্কারের কাজের মধ্যেই পরিচয় ঘটে। তারপর একেবারে খুব কাছের মানুষও হয়ে ওঠে অনাদি। এখানকার বাড়িতেও কয়েকবার এসেছে শুভদা। ফুলদা বৌদি থেকে শুরু করে মাও শুভদা'কে খুবই স্নেহের চোখে দেখেন। ওদের পারিবারিক সুখ দুঃখের অংশীদারও হয়েছে অনেকবার। তাই শুভব্রতর কাছে যাওয়াটাই পাকা করে ফেলে অনাদি।

তাড়াহুড়ো করে বেরনোর ফলে মান্থলিটা আনা হয় নি। আজকাল ভীষণ কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে একটা শেয়ালদার টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে আসে অনাদি। ট্রেণের একটু দেরী আছে। বইয়ের স্টলটার কাছে গিয়ে নিজেকে অনেকটা আড়াল করেই রাখে। যদিও আজ ছুটির দিন। অফিস যাত্রীর ভিড়ের সংখ্যা কম। একটা সিগারেট ধরিয়ে বইগুলোই দেখতে থাকে অনাদি।

শান্তিপুর লোকাল এলো নির্দিষ্ট সময় থেকে আধঘন্টা লেট করে। ওভারহেড তারে কারেন্ট না থাকার ফলে এই বিপত্তি। অফিস না থাকলেও দূরপাল্লার গাড়ীতে ভীড় বেশ রয়েছে। শেষের দিকের একটা কম্পার্টমেন্টেই উঠল অনাদি। ভিতরে ঢুকে লাইনে দাঁড়াল। আগরপাড়ায় একজন নেমে যাওয়ায় বসার জায়গাও হ'ল। অনাদির ঠিক সামনের সারিতে জানালার কাছে নববিবাহিতা এক তরুণী। সঙ্গে বোধ হয় স্বামীই হবে। মেয়েটির বয়েস বেশী নয়। অনাদি এমনিতে মেয়েদের দিকে সহজে মুখ তুলে তাকায় না। তবে এখন হঠাৎই মেয়েটির মাথার ওই টকটকে লাল সিঁদুরের দাগে চোখ আটকে গেল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ঘন কালো চুলের মধ্যে ওই উজ্জ্বল লাল রংয়ের সিঁদুরের দাগ। মেয়েটির মুখটা আর একবার দেখার ইচ্ছে হল। কিন্তু সেটা হয়ত শোভন নয়। তাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অনাদি।

দমদম থেকেই গাড়িটা থেমে থেমে চলছিল। শেয়ালদার আগে কারশেডের সামনে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই হয়েছে আর এক জ্বালা। প্রতিদিন প্রায় সব গাড়িগুলোই যেন নিয়ম করে এই কারশেডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক একবার তাই মনে হয় এইসব নতুন ধরণের ইলেকট্রিক কলকব্জার চেয়ে পুরনো কয়লার ইঞ্জিনই ছিল ভাল। অহেতুক এই ঝামেলা হ'ত না।

তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। কিন্তু কি আর করা যাবে? বিরক্ত হয়েই একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল অনাদি। পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে যাবার সময় আর একবার সেই মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। আর তাকিয়ে লজ্জাই পেল। মেয়েটিও ঠিক সেই সময় ওর দিকে দেখছিল।

শাঁখের আওয়াজ তুলে ট্রেণ গতি নিল। দরজার সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সুখী সংসারের স্বপ্ন কল্পনা করে অনাদি নিজের মনেই একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটির সিঁদুর পরা মুখ দেখে কেন যেন অনাদির মনে হচ্ছিল ভূপতির বিয়েটা সুষ্ঠ সামাজিকতার মধ্যে ঘটলে এই মেয়েটির মতই ওদের সংসারে একটা সুখের নীড় রচনা হ'ত। অথচ, ভূপতিটা যে হঠাৎ করে কি করে বসল।

চিন্তার মধ্যেই মানুষের সমুদ্র পেরিয়ে গেটের বাইরে এলো অনাদি। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে একটা বাসের হাতল ধরে উঠে পড়ল ভিতরে।

নারকেল ডাঙ্গায় শুভব্রতর বাড়িতে এর আগেও কয়েকবার এসেছে অনাদি। খুবই ভাল লাগে শুভদার কাছে এলে। আড়ম্বরহীন একক জীবনে সবার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে বেশ আছেন শুভদা। বস্তীবাড়ি হলেও এখানে কোনও নোংরামি নেই। সি-এম-ডিয়ের কল্যাণে রাস্তাঘাটও পরিষ্কার হয়েছে অনেক। তাছাড়া শুভদার নিজের নিরলস পরিশ্রম তো আছেই। আর তার ফলেই পাশাপাশি সবাই সম্প্রীতি বজায় রেখেই চলেছে। এলাকার প্রায় সব ছেলে-মেয়েদেরই মাষ্টারমশাই শুভদা। ওরা তো আছেই, রাত্রে আবার বয়স্ক লোকদেরও পড়ান। শুভদার নিজের রান্নাঘর থেকে শুরু করে সবকিছু দেখা শোনা করার জন্য একজন বয়স্কা বিধবা শুধু আছেন, তাকে শুভদা মা বলেন।

নির্দিষ্ট স্টপে নেমে এগিয়ে যায় অনাদি। বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় অল্প কাদা জমেছে। একটা নোংরা ফেলার জায়গা উল্টে পড়ে আছে ড্রেনের মধ্যে। সেখানে কয়েকটা কাক আর কুকুর মারামারি শুরু করেছে। অনাদির কেমন যেন বমি বমি লাগল। আস্তে আস্তে পা ফেলে শুভব্রতর ঘরের কাছে এসে থামল অনাদি।

দরজায় হাত রেখে ডাকতে যাবার মুখেই বুড়ি মা পিছনে এসে দাঁড়াল। কলে জল আনতে গিয়েছিল। অনাদি একটু সরে দাঁড়াল। বুড়িমার পিছনেই ঘরে ঢুকল।

জলের কলসী নামিয়ে অনাদির দিকে এগিয়ে এসে বুড়ি মা বলল, ওমা, দাদাবাবু যে। তা' কি মনে করে?

কিছু না, এমনি। শুভদা' কোথায়? তক্তপোষে বসেই জবাব দেয় অনাদি। শুভব্রতর কথা শুনেই কাঁদ কাঁদ মুখে বুড়িমা বলে,

তার কথা আর বলুনি বাপু। আমার হয়েছে শতেক জ্বালা। দু'দিন আগে ঘণ্টি বাজিয়ে কি এক চিঠি দে গেল পিওন। তা' সেই চিঠি পড়ে বাবা আমার বিছানায় মুখ ঢাকল। আবার উঠে বসল। আমি শুধোলাম তা কিছুই বললে না। শেষে কাল রেতের বেলায় ঝোলা গুছিয়ে, বাবা বিশ্বনাথের কাছে যাচ্ছি বলে বেইরে গেল। একটানা কথা বলে একটু থামল বুড়ি মা। তারপর দম নিয়ে শুরু করল,

আমাকে শুধু বলল ফিরতে ক'দিন দেরী হবে। সেই চিঠি আসার পর নাওয়া নেই খাওয়া নেই খালি চিন্তা আর চিন্তা। তা তোমরা কিছু জান তার কি হয়েছে? কথা শেষ করে এবার হাঁফাতে থাকে বুড়িমা।

কথা শুনে সব না বুঝলেও অনাদি এটুকু জানল কাশীতে হয়ত শুভদা'র জ্যাঠামশাইর কোনও অসুখ টসুখ কিছু হয়েছে। বুড়ো মানুষ একা একা থাকেন। দেখাশোনা করার লোক বলতে তো পান্ডা। তা' সে যাই হোক শুভদাকে না পেয়ে মনটা আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এমনিতেই নিজের বাড়ির অমন একটা মানসিক আঘাতে মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। তার উপর শুভদা'র জ্যাঠামশাইর অসুখের সংবাদটাও নিঃসন্দেহে দুঃখবহ। অনাদির ভারাক্রান্ত মনটা এইসব নানা জটিল চিন্তার আবর্তে পড়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

বুড়ি মা অবশ্যি চা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনাদির এখন এখানে বসে চা খেতে ভাল লাগবে না। ও তাই নিজের আসার কথা শুভদাকে জানাতে বলে আর বুড়িমাকে কোনও চিন্তা না করার উপদেশ দিয়ে ঘর থেকে আবার রাস্তায় নামল।

একটা মরা বেড়ালের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে কয়েকটি ছেলে হৈ হৈ করে সামনের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা ধরাল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার সেই একই চিন্তার স্রোত মাথায় বইতে শুরু করে। শুভদা তো কাশীতেই গেছেন এটা জানা গেল। তাই তাকে নিয়ে ওদের বাড়ির সমস্যার সমাধানের কোনও আশাই আপাততঃ নেই। বাড়িতে যে কি হচ্ছে সে কথা চিন্তায় আনার শক্তিটুকু পর্যন্ত অনাদি হারিয়ে ফেলেছে। সাহসও যেন নেই আর। এই মুহূর্তে বাড়ি ফেরার কথাও মনে আসছে না। এখন যেন বলতে গেলে নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাইছে অনাদি। পরিচিত গণ্ডিতে এতক্ষণ হয়ত সবাইকে ভূপতির ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। আর সরস আলোচনার মাধ্যমে ওদের সবাইকে সার্কাসের ক্লাউন সাজিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছে।

শরীরের মধ্যে কেমন যেন গুলিয়ে উঠছে। বেলাও হয়েছে। এতক্ষণে অনাদি টের পেল খিদে পেয়েছে ওর। সকালে সেই বৌদির হাতের এক কাপ বাজে চা ছাড়া এতটা বেলা অব্দি কিছুই পেটে পড়েনি।

সামনেই একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল। আর কিছু চিন্তা না করে সোজা চায়ের দোকানেই ঢুকে পড়ল অনাদি।

মাঝখানের গোল টেবিলটা জুড়ে কয়েকটি ছেলে তুমুল তর্ক করে যাচ্ছে। ওদের উত্তেজিত কথার শব্দগুলো অনাদিকে আকৃষ্ট করল। আরব আর আফগানিস্থান থেকে শুরু করে ভিয়েৎনামে নারকীয় নারী নির্যাতন আর শিশু হত্যার উত্তেজক আলোচনায় ওরা তখন ব্যস্ত।

ধীর পায়ে অনাদি ওদের পাশের একটি চেয়ারে বসল। চায়ের দোকানের ছেলেটি কাছে আসতেই শুধু এক কাপ চায়ের কথা বলে আর একটা সিগারেটই ধরাল। যদিও কিছু খাবে বলেই দোকানে ঢুকেছিল। কিন্তু পরিবেশ দেখে আর খেতে ভাল লাগল না।

অনাদিকে হঠাৎ এভাবে ওদের পাশে বসতে দেখে ছেলেগুলো একসঙ্গে ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু অনাদির গম্ভীর মুখ দেখেই আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। আলোচনার গতি এবার ভিয়েৎনাম থেকে বেকার সমস্যা আর শিল্প-সাহিত্যের গতি প্রগতির দিকে এগিয়ে চলল। সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ডহীনতাও বাদ পড়ছে না। ওদের উত্তেজিত কথাগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগছিল।

দলের মধ্যে একটু বেশী বয়সের ছেলেটি এবার ভারি গলায় বলল,

তাই বলছি, ওসব ভিয়েৎনাম আরব ছেড়ে নিজেদের দেশে রাজনীতির নামে যে সব নোংরামি চলেছে তারই কথা একটু চিন্তা কর প্রদীপ, সব সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবি।

অনাদি তাকিয়ে দেখল প্রদীপ নামে ছেলেটির মুখ তখনও বেশ লাল হয়ে রয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুল। ছেলেটির কথায় একটু এগিয়ে বসে প্রদীপ বলল,

সে কথা তো শুরুতেই বললাম। আমাদের দেশে এখন আর রাজনীতি আছে নাকি। সব তো স্বার্থনীতি আর দুর্নীতি নিয়ে মেতে আছে। দেশের কথা মানুষের কথা ভাববার সময় কোথায়?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল প্রদীপ। পাশের ছেলেটিই কিছু বলতে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু তার আগেই অনাদি চেয়ারটা টেনে বসে ওদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

কিছু মনে করবেন না ভাই। আলোচনায় একটু অংশ নিচ্ছি।

অনাদির কথায় ছেলেগুলো ওর দিকেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায়। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অনাদি বলে,

আমার মনে হয়, প্রদীপবাবু শেষে যে কথাগুলো বললেন তার সবই ঠিক। তবে চিন্তার একটু হেরফের আছে।

কি রকম ? দৃপ্ত ভঙ্গিতে অনাদির দিকে তাকায় প্রদীপ।

একটু হেসে অনাদি বলে, বর্তমানে আমাদের দেশে হয়ত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের নিজেদের দিকটা বড় করতে অনেকভাবে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই সব স্বার্থবাজদের মুখোস খুলে ফেলতে খুব একটু পরিশ্রমের দরকার হয় কি ? আমার মনে হয় হয়-না। কিন্তু তবুও তারা সেই মুখোস পরে আমাদের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ—আমরা সবাই একেবারে ক্লীব হয়ে পড়েছি।

মহান ভারতবর্ষের যে সংগ্রামী আদর্শ, যে ভালবাসার আদর্শ, যে মহামিলনের আদর্শ, সেইসব চিন্তাধারাগুলো,—যা একদিন স্বামী বিবেকানন্দ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আর মহাত্মা গান্ধীর মত বরেণ্য দেশপ্রেমিক আমাদের শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁদের সেইসব ভালবাসার কথাগুলোই ভুলে বসে আছি। তাই আমাদের বর্তমান চিন্তাধারাতেও এসেছে ভাঙ্গন।

একভাবে কথা বলে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে অনাদি। ছেলেদের মুখের দিকেও তাকায়। ওদের উত্তেজনা এখন অনেক কম। হয়ত বা এভাবে ওদের আলোচনায় অংশ নেওয়াটা ওদের পছন্দ হয় নি, আর না হয় অনাদির আলোচনাটা গুরুগম্ভীর স্তরে পোঁছেছে। যা হোক একটা কিছুর জনাই হয়ত ওরাও গম্ভীর হয়ে আছে।

স্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রদীপ নামে ছেলেটিই কথা বলে। উঠে দাঁড়িয়ে অনাদির দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখেই বলে,

আপনার কথাগুলো সত্যি ভেবে দেখার মত, তবে যুক্তির খাতিরে অন্য কথাও বলা চলে।

বেশ তো বলুন না। অনাদিও হেসে মাথা নাড়ে। বাধা দেয় অন্য একটি ছেলে। প্রদীপের হাত ধরে বলে,

আরে কি শুরু করলি বল তো। সব জায়গাতেই শালা গুরুগিরি। কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে। ওদিকে আজ রিহার্শাল আছে না। দেরী হলে আবার জগুদা যদি ভেগে যায় তবে তো দফা গয়া। তাড়াতাড়ি খেয়েই তো বেরিয়ে পড়তে হবে। তাই, কিছু মনে করবেন না দাদা। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান আর না হয় এখানেই আর একদিন আসুন চুটিয়ে জ্ঞান দেয়া নেয়া করা যাবে। শেষের কথাটা অনাদিকে লক্ষ্য করে বলেই হেসে ওঠে ছেলেটি। অন্যরাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

অনাদি হাসতে গিয়েও থেমে যায়। প্রদীপ ওকে নমস্কার জানিয়ে সবার সঙ্গেই রাস্তায় পা বাড়ায়।

চায়ের দাম মিটিয়ে অনাদিও বেরিয়ে আসে দোকান থেকে। কিছুই আর ভাল লগেছে না। ভেবেছিল ছেলেদের সঙ্গে গল্পে কিছু সময় কেটে যাবে। কিন্তু সেটাও ভাল হল না। আজকাল প্রায় সব ছেলেই এই রকম। কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করার মত চেষ্টাই নেই। তবে এতে অনাদি কোনও সময়েই এই সব ছেলেদের দোষ দেয় নি। কারণ চারপাশের এক চরম নিস্পৃহতার মধ্যে বড় হয়ে উঠছে ওরা। জন্মাবার পর থেকেই নৈরাশ্য আর নৈরাজ্যের জগতের মধ্যে যাদের পদক্ষেপ ফেলতে হচ্ছে তাদের চিন্তাধারায় গভীরতা আসবে কি করে? তবুও ওদের মধ্যে প্রদীপ ছেলেটিকে ভাল লাগল।

এখন আর কিছুই করার নেই। অনেকক্ষণ পরে আবার বাড়িতে ফেরার কথাই মনে হল। এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার কোনও মানে হয় না। তবে একবার শ্যামবাজারে ওদের পুরনো বাসার দিকে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু সেখানে তো ভনিমারাও থাকে। না ওদিকে নয়।

আনমনাভাবে রাস্তায় চলার জন্যই একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। অনাদি একটু লজ্জিত হয়েই তাকাল। লোকটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি হতেই অনাদি চিনল লোকটি অনিমেষ হালদার। অনিমেষও ততক্ষণে এসে হাত বাড়িয়েছে, হ্যাল্লো অনাদি!

আরে অনিমেষ তুই?

আমি না হয়ে, শাড়িপড়া কেউ হলে খুশী হতিস বোধ হয়।

অনিমেষের চটুল কথার জবাব না দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অনাদি। ওর দিকে একটা দিয়ে নিজেও ধরায়। তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরাতেই বলে, আজ ছুটির দিন—ক্লাবে না গিয়ে তুই এখন রাস্তায়।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে অনিমেষ হাসতে হাসতে বলে, আর বলিস কেন, তোর দাদার জন্যই তো আটকে গেলাম।

মানে—? অনিমেষের জবাব শুনে কেমন চমকে ওঠে অনাদি। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অনিমেষই আবার বলে,

মানে আর কি! ঘটিত ব্যাপার। প্রেম-বিরহ-প্রীতি-পরিণয়-ইত্যাদি। কেন, তোরা কিছুই জানিস না?

অনিমেষের এবারের কথায় অনাদির মনের ভয়টা আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। সংযমের বাঁধে ভিতরের ঘূর্ণিঝড়টা আর বাঁধ মানতে চায় না। তবুও নিজেকে যথা-সম্ভব সংযত করেই অনাদি বলে, আমাদের কথা থাক। ভূপতির কথা তুই কি জানিস তাই বল।

জানাজানির আর কিছু নেই ব্রাদার। এবারে লাইন ক্লিয়ার। তুমিও দুর্গা বলে ঝুলে পড়তে পার।

অনিমেষ—। একটু জোরেই ডেকে ফেলে অনাদি। পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বলে, রাস্তার মাঝখানে রঙ্গরস ভাল লাগছে না। এখানে কোথাও ভাল চায়ের দোকান জানা আছে তোর। তাহলে চল সেখানে বসেই তোর সব বাহাদুরীর কথা শোনা যাবে। তা ছাড়া খিদে পেয়েছে। আমার কিছু খাওয়া প্রয়োজন।

অনিমেষকে আর কোনও কথা বলতে সুযোগ না দিয়েই হাত ধরে টান দেয় অনাদি। বড় রাস্তা পেরিয়ে মোটামুটি একটা সুস্থ হোটেল কাম চায়ের দোকানে এসে ঢোকে। অনিমেষ আসলে ভূপতিরই বন্ধু ছিল। পাশ করতে না পারায় কলেজে অনাদির সঙ্গেই পাশ করে বেরোয়। বিরাট বড়লোকের ছেলে। তবে খুব একটা বড়লোকী অহংকার নেই। অনাদিদের মত পরিবেশের ছেলের সঙ্গেও সহজে মানিয়ে নিতে পারে। বাবার ব্যবসার টাকাগুলো নানা-রকম ক্লাব, ফাংশান আর মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবী নিয়ে বাইরে হৈ হৈ করে ঘুরে বেরানোতেও খরচ করে। কিছুটা খেয়ালী। গাড়ি থাকলেও কেন যেন প্রায়ই ট্রামে বাসেই ঘোরে।

দোকানে ঢুকে দু'প্লেট মোগলাই আর চায়ের অর্ডার দেয় অনিমেষ। চেয়ারে বসে অনাদির মুখের দিয়ে তাকিয়ে হেসেই বলে, নে আর একটা সিগারেট দে। রাস্তার মধ্যে যে ভাবে মাষ্টারদের মত ধমক দিল আমি তো পড়েই যাচ্ছিলাম ভয়ে।

অনিমেষের কথায় সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে অনাদির মুখে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পকেট থেকে বের করে টেবিলে রাখে। অনিমেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে,

ভূপতির যে রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল তনিমার সঙ্গে, তোরা এ খবর জানিস না?

বিশ্বাস কর অনিমেষ, আমরা কেউই এটা ভাবতে পারিনি। এতক্ষণে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে অনাদি। ভূপতির এই দিককার কঠিন আঘাতের ছবিটা এতক্ষণ মনের গভীরে চাপা পড়েই ছিল। সব সময় শুধু পারিবারিক পরিবেশ আর মা'র কথাটাই মাথার মধ্যে তোলপাড় করছিল। রূঢ় বাস্তবের এব কঠিন আঘাতের ছবিটা যখন অনিমেষ অনাদির চোখের সামনে তুলে ধরল, তখন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না ও।

অনিমেষ হালদারকে আত্মার আত্মীয় ভেবেই আজ সকাল থেকে ওর এই অনিমেষের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, ভূপতির বাজারে যা যা হয়েছে আর মনে মনে এসেছে সব কথা অকপটে বলতে লাগল অনাদি। কথাগুলো বলে যেন নিজেকেই ভারের বোঝা থেকে হাল্কা করতে চাইল।

অনিমেষ অবশ্যি মোগলাই খেতে খেতে হাল্কা মেজাজের অনাদির কথা শুনছিল। তবুও অনাদি যখন দক্ষিণেশ্বরে ভূপতির বিয়ের কথা পাকা হওয়ার খবরটা বলল, তখন বড় বড় চোখে খাওয়া বন্ধ করে কি যেন ভাবছিল। অনাদির খাবারের প্লেটটা সামনে রয়েছে। খেতে ভাল লাগছে না। অনিমেষই বলল, নে খেয়ে নে।

প্লেটটা সামনে নিয়ে ছুরি বসিয়েই ঠেলে দেয়—অনাদি। অনিমেষ বলে, কি হল ?

মৃদু হেসে অনাদি বলে, খাওয়াটা কপালে নেই আজ। যা দেখে ঘেন্না করি ঠিক তাই। কথাটা বলে প্লেট থেকে আঙ্গুল দিয়ে একটা বড় চুল তুলে দেখাল অনাদি। অনিমেষ উঠে বলতে যাচ্ছিল। অনাদি ওকে থামাল, না-না কিছু বলিস না। এখন এত বেলায় আর এ সব ভাল লাগবে না। বরং কড়া এক কাপ চা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথার মধ্যেই দু'কাপ চা নিয়ে একটি ছেলে ওদের সামনে রাখে। চায়ে চুমুক দিয়ে অনাদি বলে,

ওরা কোথায় উঠবে তুই জানিস কিছু ?

ও সব তো ক'দিন আগেই ঠিক করেছে ভূপতি। বাগবাজারের দিকে একটা ছোটমত ফ্ল্যাট নিয়েছে। আপাতত সেখানেই। সেলিব্রেটও সেই বাড়িতেই করবে। আজ শুধু ব্লু ফক্সে নমিনাল একটা পার্টির ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু এত টাকা ও পেল কোথায় ?

তোরা দেখছি ভূপতির কোনও খবরই রাখতিস না। মোটা টাকা তো তনিমারই রয়েছে। ওর আগের স্বামীর লাইফ-ইনসিওরেন্সের সব টাকাই তো ব্যাংকে ওর নামে ছিল। একমাস আগে তনিমাই সে সব ভূপতির এ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে। তাছাড়া—

কথা বলতে বলতেই অনাদির অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে একটু থামে অনিমেষ। অনাদি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, তাছাড়া কি বল।

না-আর কি আবার। বলছিলাম তনিমার কাছেই শুনলাম ওদের বাড়িতে নাকি এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগই ওঠেনি। বরং ভূপতির মহত্বে সবাই খুব খুশী। তোরা এ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিলে ওরা নাকি আচার নিয়মের সামাজিক অনুষ্ঠানেও রাজি।

চুপ কর অনিমেষ চুপ কর। আমি সত্যি এসব ব্যাপারে কিছু ভাবতেই পারছি না। বার বার শুধু আমার মা'র কথাই চিন্তা হচ্ছে। মা'কে তো তুই চিনিস। তিনি কি ভাবে এই ঘটনাকে মেনে নেবেন বল তো ! কথা বলতে বলতে দুই হাতে নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে অনাদি। অনিমেষেরও আর এভাবে

অনাদির সঙ্গে বসে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সামিল হওয়ার মত সময় নেই। হঠাৎই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও বলে,

থ্যাঙ্ক গড এ যে তিনটে বাজতে চলেছে। আজ চলিরে অনাদি। উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের সামনেটা একটু ঝেড়ে নেয় অনিমেষ। কাউন্টারে গিয়ে দাম মিটিয়ে আবার সেই চটুল হাসিতে বলে,

ছেড়ে দে। এসব সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে আজকের পৃথিবীতে কেউ ভাবে না কি। যা হবার হয়ে গেছে। উই আর অল গ্রোনআপ, এবং বিচার বুদ্ধি নিয়েই সামনের দিকে এগোচ্ছি। কাজেই চিন্তা রেখে একটু হেসে নে। তোর কিছু এরকম হলেও আমাকে আগে খবর দিস। দেখবি ঠিক হাজির হয়ে গেছি। আমি ঠিকই করেছি, তোদের সবার এইসব ভালবাসার বিয়ের রাজসাক্ষী হয়েই জীবন কাটিয়ে দেব।

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ায় না অনিমেষ। দ্রুত রাস্তায় নেমে পড়ে। অনাদি ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে এবারে একটু হাসে। সত্যি ঠিক কথাই বলল অনিমেষ। আজকের পৃথিবীতে ভূপতির এই ব্যাপারটা কোনও ঘটনাই নয়। রেজিস্ট্রী ম্যারেজের মত সামান্য একটা ঘটনায় ওদের সংসারে কোনও উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। কারণ ওদের পরিবেশে মা আর মেয়ে প্রতিযোগিতা করে সেজে নিজেদের যৌবনকে সমানভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। বাবা ম্যাচিওর্ড ছেলেকে ড্রিঙ্কস্ অফার করে। তাই অনিমেষ হালদার আজ অনাদিকে কোনও সান্ত্বনার বাণীই শোনাতে পারবে না।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আর চিন্তা ভাল লাগছে না। শেয়ালদাগামী একটা ট্রাম এসে থামতেই ছুটতে ছুটতে উঠে পড়ে অনাদি। এখন বাড়ি ফেরাই সব চেয়ে আগে প্রয়োজন। না জানি সেখানে আবার কোন নাটকের মহড়া শুরু হয়েছে।

স্টেশনে বেশ ভিড়। ভিতরে ঢুকে অনাদি শুনল বেলা একটা থেকে গাড়ি বন্ধ। সব প্ল্যাটফর্মেই একটা করে গাড়ি দাঁড়ান। অগুন্তি মানুষের মাথা। বাসে করে শ্যামবাজারে গেলেই ভাল হত। সেখান থেকে বাসও মিলত। কিন্তু তখন তো আর ট্রেন বন্ধের কথা জানা যায় নি। মাঝে কিছু লোকের হৈ-হৈ শব্দ আর ট্রেনের ভোঁ ভোঁ শব্দ এই হচ্ছে। লোকগুলো অস্থির ভাবে ঘুরছে।

হঠাৎই মাইকে ঘোষণা হল। রানাঘাটের কাছে লাইনে কিছু লোক অবরোধ করার ফলে ট্রেনের এই বিপত্তি চলেছে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধের জন্য তাই আপাততঃ কয়েকটি ট্রেন কল্যাণী পর্যন্ত চালাবে। একটু থেমে আবার ঘোষিত হল, ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কল্যাণী স্পেশাল কিছু সময়ের মধ্যে ছাড়বে।

খবর শুনে সবার সঙ্গে অনাদিও ছুটল ছ'নম্বরের দিকে। ঠেলাঠেলি

কনুইয়ের গুঁতো আর ধাক্কা সামলে কোনও রকমে মাঝামাঝি একটা কাম্পার্টমেন্টে উঠে ভিতরে আসতে পারল অনাদি। বাস্ এখন একটু স্বস্তি।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গার্ড সাহেবের সময় সংকেত পেয়ে কল্যাণী স্পেশাল নড়ে উঠল। শাঁখের আওয়াজ তুলে চলতেও শুরু করল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর মতও অবস্থা নয় তখন। প্যাসেঞ্জের এক একটা সারিতে গাদাগাদি অবস্থায় লোক দাঁড়িয়ে। গরু ছাগলের গাড়ি গুলোও এর চেয়ে ঢের ভাল।

অনাদি পিছনে দাঁড়ান এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে থাকা এক সৌভাগ্যবানের তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে। বিষয় নস্যি। দাঁড়ান ভদ্রলোকের হাতের কিছু নস্যির গুঁড়ো বসে থাকা লোকটির নাকে ঢুকেছে, প্যান্টেও পড়েছে। তাইতেই ঝগড়ার শুরু।

ছোট ছোট রসাল মন্তব্য শুনতে শুনতে লোকের ভিড় আর ততটা অসহ্য মনে হচ্ছে না এখন। উল্টোডাঙ্গা আর দমদমেও লোক ওঠার ভিড়। আজ খুব একটা লোক আর উঠতেও পারল না। সোদপুর ছাড়ার পর কিছুটা কমল। তবে বসার জায়গা নেই। অনাদি এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ওর স্টেশনও এসে যাচ্ছে। নামার সময় আবার ঝামেলা না হয়।

স্টেশনে নেমে অনাদি ভাবল, একবার বাজার কমিটির অফিসটা ঘুরে যাবে। কিন্তু গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই চমকে ওঠে অনাদি। রিক্সা স্ট্যাণ্ডের কাছে বড় বট গাছটার নীচে সুব্রত দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। বুকখোলা জামা। প্রায় ছুটে সুব্রতর সামনে এসে অনাদি বলে,

কি হয়েছে ফুলদা—বাড়িতে সব ভাল তো !

বাড়ি চল। তোর জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সুব্রতর গলা দিয়ে কান্নার সুরে বেরিয়ে আসা কথা গুলো শুনে ; অজানা একটা ভয় অনাদির সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সারাদিনের না খাওয়া শরীরও আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। টলে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তেই সুব্রতর হাত ধরে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর বলে,

আমার জন্য তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? মা ভাল আছেন তো ?

অনাদির পিঠে হাত রেখে শান্ত গলায় সুব্রত বলে, হ্যাঁ মা ঠিক আছেন। সবাই তোর জন্যই অপেক্ষা করছেন। কমিটির অফিসে খোঁজ করে না পেয়েই ভাবলাম তুই হয়ত কলকাতায় শুভব্রতর কাছে গেছিস। তা এত দেরী করতে হয়। আমার কথাটা তোরা কেউই একবার চিন্তায় আনলি না। যাক্ এখন চল।

অনাদিকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সামনের একটা রিক্সায় উঠে বসে সুব্রত। অনাদিও পাশে বসে। যেতে যেতে বার বার মার কথাই জিজ্ঞাসা করে অনাদি। সুব্রত প্রতিবারেই মাথা নেড়ে ভাল বলে। হঠাৎই বাবার মুখের ছবি

ভেসে ওঠে অনাদির সামনে। আর সেই ছবিটার কথা জানাতে গিয়েই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুব্রত।

বাড়ির অল্প কিছু দূরে থেকেই একটা ছোটখাঠ ভিড় চোখে পড়ে। কান্নার শব্দও যেন ভেসে আসছে। রিক্সা থেকে লাফিয়েই নামছিল অনাদি। সুব্রত ওকে সামলে রাখে। ভাড়া মিটিয়ে অনাদিকে ধরে ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে ঢোকে সুব্রত। অনাদি পাগলের মত সামনের মেয়েদের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এক একটা ঝড় শুধু যে মানুষের ঘর বাড়ি মাটিতে ফেলে দিয়েই শান্ত হয় তা নয়। সর্বনাশা সেই ঝড়ে কারও কারও দাঁড়ানোর চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে যায়। ঘরের মধ্যে পা রেখেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় অনাদির কাছে। সত্যি এ যে অকল্পনীয়। না-না-এ হতে পারে না। কখনই নয়। বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাছাড়া যে মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়া নীচে নামতেই পারেন না। তাহলে এ কে?

মানসী শ্যামল অন্যসব পরিচিত পরিজন সবাই কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল অনাদিকে দেখে। কেউ কিছু বলছে না কেন? অনাদির চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, তোমরা সবাই এভাবে চুপ করে আছ কেন। কি হয়েছে ওই ব্রজমোহন বাবুর। আমাকে দেখে ভয় কিসের? বল না তোমরা একটা কিছু কথা অন্তত বল।

হঠাৎই চোখ গিয়ে পড়ল বাবার মাথার কাছে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকা একজনের দিকে। মা-ইতো ওখানে বসে। ভাল করে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আবার সেদিকে তাকাল অনাদি। তারপর সব ভাবনার ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলে মা—বলে চিৎকার করে উঠল একবার। সুব্রত ওর দিকে এগিয়ে আসতেই তাকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের মত মার বুকে আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল অনাদি।

চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বাইরে এল শ্যামল। সুব্রত এগিয়ে গিয়ে অনাদির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে কাপড়ে মুখ ঢেকে মানসীও কাঁদছে। বাইরের বারান্দায় কারা যেন সব কথা বলছে। একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সুব্রতকে বলল, আমরা রেডি সুব্রতদা।

ছেলিটির কথায় চমকে তাকাল সুব্রত। অনাদিও ধীরে ধীরে মুখ তোলে। ছেলেটিকে নিয়েই বাইরে আসে সুব্রত। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ। আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। সংকীর্তনের দলটা শুধু আশার অপেক্ষা। সুন্দরভাবে রজনীগন্ধার মালা আর ফুল দিয়ে সাজান হয়েছে খাট। ধূপের গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক।

সুব্রতর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল শ্যামল। একভাবে তখন থেকে ছুটোছুটি গেছে। তারপর ফুলদা স্টেশনে যাওয়া থেকে মার কাছে বসে থেকে ভাল করে কান্নারও সুযোগ হয় নি। তাই এখন প্রস্তুতি পর্বের শেষ অধ্যায়ে সুব্রতকে একটু একলা পেয়ে প্রথমেই পকেট থেকে ডেথ্ সার্টিফিকেটটা বের করে এগিয়ে দেয়। সুব্রত জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না শ্যামল। ফুলদাকে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মানসী যেন ঘটনাটা এখনও ঠিক সত্যি বলে ভাবতে পারছে না। বেশ কয়েকবার পলকহীন চোখে রাঙ্গামাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও সান্ত্বনার ভাষাই জোগায় নি মুখে। উনি কি সত্যিই পাথর হয়ে গেলেন। ছোটবেলার একটা প্রায় মুছে যাওয়া স্মৃতি আবার নতুন করে ভেসে উঠছে মানসীর মনের আয়নায়।

ওর মাও বাবার অকাল মৃত্যুতে ঠিক এই রকম একটা চিৎকার করে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন। অতি বড় আঘাতে বা শোকে কোনও কোনও মানুষের জীবন নাকি এই ভাবে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বোবা হয়ে থাকে, আর তারপর জীবন হয়ে ওঠে এক দুঃসহ যন্ত্রণার বোঝা। অন্তত মানসীর মার বেলায় তো তাই ঘটেছিল। বাবার মৃত্যু আকস্মিক হলেও সে শোক কিছুতেই সামলাতে পারেন নি তিনি, কান্না যেন শুকিয়ে গিয়েছিল তার। নিজের হাতে শাঁখা ভেঙ্গে আর সিঁদুর মুছে বৈধব্যের বেশ পড়েছিলেন মানসীর মা। তারপর দুমাসের মধ্যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিজকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর ক্ষতবিক্ষত মনটাকে পরিপূর্ণ শান্তি দিতেই একদিন গলায় কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ডুবেছিলেন।

রাঙ্গামাসিমার এই মুহূর্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানসীর মনে বার বার ওর মার সেই ছবিগুলোই কেন যেন চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে।

অনাদি তখনও মার কাছেই বসে আছে। মাঝে মাঝে মানসীর দিকেও তাকাচ্ছে। কিন্তু এখন আর কিই বা বলার আছে। সব জিজ্ঞাসার শেষ তো এই মানুষটাই করে দিয়ে গেলেন।

অনাদির খোঁজ করতে অনেককেই পাঠিয়েছিল সুব্রত। শেষে ও নিজেই শুভব্রতর কথা চিন্তা করে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত বেরিয়ে যাবার পর মানসী কয়েকবার রাঙ্গামাসিমার কাছে এগিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাছে গিয়েই থেমে গেছে। রাঙ্গামাসিমার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় হয়েছে। তাছাড়া প্রথমবার হাত ধরলে কেমন যেন ঘৃণায় মানসীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন রাঙ্গামা। কথাটা মনে হলেই বার বার কান্নায় দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে মানসীর।

বাইরে খোল করতালের শব্দ হতেই সচেতন হয়ে ওঠে মানসী। রাঙামাসীমাও একটু কেঁপে ওঠেন। অনাদি মাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায় মানসী। রাঙামার কাছে কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। ব্যস্তভাবে মানসীর কাছে এসে চাপাস্বরে সুব্রত বলে,

আলমারী থেকে দু'শো টাকা আর আমার গামছাটা তাড়াতাড়ি এনে দাও তো।

কিছু কথা বলার থাকলেও বলা যায় না। মানসীর কথা শোনার মত মনই বা এখন কোথায় সুব্রতর! একবার সুব্রতর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ওর ঘরে ঢুকে যায় মানসী।

কয়েকজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় উঠে আসে শ্যামল। সুব্রত এতক্ষণ নিজেকে সামলেই রেখেছিল। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে আর স্থির থাকতে পারল না এখন। শব্দ করেই কেঁদে উঠল। দরজা থেকে ছুটে ওর কাছে এল শ্যামল। প্রতিবেশী একজন সুব্রতকে ধরে সান্ত্বনার কথা বলতে থাকে। হঠাৎই ভূপতির কথা মনে আসে। দু'হাতে চোখের জল মুছে শ্যামলকেই বলে, মেজকে একটা খবর তো দেওয়া দরকার শ্যামল। তার কি হবে!

সুব্রতর কথা শুনে একটু সময় চুপ করে থাকে শ্যামল। তারপর উঠোনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের একজনকে ইশারায় কাছে ডাকে। ছেলেটি কাছে আসতেই সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিকানা বলে দিলে সুহাস গিয়ে শ্যামবাজারের সেই বাড়িতে খবরটা দিয়ে আসবে!

সুব্রত আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। শ্যামলের কথাটাই ঠিক মনে হয়। আসুক না আসুক খবরটা তো দেওয়া কর্তব্য। তাছাড়া এখন আর ওদের কারও কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাই পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ভূপতিকে দুঃখবহ খবরটা একলাইনে লিখে ফেলে সুব্রত। অপরদিকে তনিমাদের বাড়ির ঠিকানা লিখে সুহাসকে সব বুঝিয়ে দেয়। শ্যামল আবার ওকে ডেকে দু'টো টাকা দিয়ে দেয়। নিজেও কিছু বলে। ঘর থেকে টাকা আর গামছা নিয়ে সুব্রতর কাছে আসে মানসী। শ্যামল ঘরে ঢোকে। আবার নতুন করে কান্নার শব্দ শুরু হয়।

ফুলের মালা আর চন্দন দিয়ে তাড়াতাড়ি মেসোমশাইর নিশ্চল দেহটাকে সাজাতে থাকে মানসী। রাঙামাসিমা একটু সরে বসেছেন। অনাদি বাবাকে ধরে আছে। মানসীকে সাহায্য করছে শ্যামল আর একটি মেয়ে।

কান্নায় বার বার ভেঙে পড়ছে মানসী। তবুও নিজেকে সংযত করে চন্দন দিয়ে ভাল করে সাজাতে থাকে। শেষ যাত্রা তো। তাই যেন নিখুঁত হয়। ভট্টাচার্য বাড়ির মাসীমা কয়েকটা কড়ি আর সোনা রুপোর একটু করে টুকরো নিতে বললেন। মেসোমশাইর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই এক সঙ্গে মনে

পড়ে যায় মানসীর। এই একটা মানুষই ওর সব ব্যথার নীরব সাক্ষী ছিলেন। আর এই মানুষটিকে পেয়েই মানসী বাবার অভাব বুঝতে পারে নি। আজ সেই পরম আশ্রয়টুকুও আর রইল না। নিঃস্ব রিক্ত মানসী তাই চোখের জলের অমঙ্গল রেখা না টেনে ব্রজমোহন বাবুকে নিজের মনের মত করেই সাজাতে লাগল। নতুন গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতিতে যেন মনে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে একটু পরেই মেসোমশাই বলবেন, কই মা মনি, আজ কি নতুন খাবার বানিয়েছ নিয়ে এস। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

কান্নার শব্দকেও ছাপিয়ে-সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনি ভেসে উঠল। মানসীর বুকটা যেন বিছুতে আটকে গেছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে খুব। বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একরকম জোর করে মুখে কাপড় চেপে কান্না সামলে রেখেছে মানসী। কিন্তু আর বোধ হয় বেশীক্ষণ এভাবে থাকা যাবে না। অব্যক্ত একটা ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে সমস্ত শরীর।

মেসোমশাইর দেহটা ধরাধরি করে ওরা বাইরে বের করতেই বুকটা চেপে ধরে তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকল মানসী। রাঙ্গামা উপুর হয়ে শুয়ে পড়েছেন, ঠিক যেখানে এতক্ষণ মেসোমশাই শুয়েছিলেন। চারপাশে কিছু রজনীগন্ধার ফুল আর ধুপকাঠি ছড়ানো রয়েছে। ঘরের সব জিনিষও এলোমেলো ছড়ানো। এই মুহূর্তে ঠিক কি করা উচিত সেটা বুঝতে না পেরেই মানসী পায়ে পায়ে রাঙ্গামাসিমার কাছেই এগিয়ে যায়।

মজুমদার মাসিমা মানসীকে ডেকে বলেন, এবার তাহলে তোমার শাশুরীর দিকে নজর দাও বৌমা। একটু শক্ত হও। তোমাকেই তো সব সামলাতে হবে।

মজুমদার মাসিমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় মানসী। কিন্তু এ সময় যে কি করতে হবে সে তো মানসী জানে না। বয়স্কা মহিলারাও কিছু বলছেন না। চিন্তার মধ্যেই পাড়ার সবচেয়ে বর্ষীয়সী চক্রবর্তী ঠাকুরনের গলা শুনতে পায় মানসী। সবার বিপদে আপদেই ছুটে আসেন তিনি। পাড়ার ছেলে বুড়ো সবারই কত্তামা।

কান্নার সুরে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন কত্তামা। মানসীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কত্তামার সংগে রাঙ্গামাসিমার বাপের বাড়ির কি একটা সম্পর্কও আছে। তাই উনি আসাতে বেশ কিছুটা চিন্তার হাত থেকে নিজেকে রেহাই দিতে চায় মানসী। ভুপতিকে খবর দেওয়া হয়েছে কি-না মানসী জানে না। এখন হঠাৎই ভুপতির কথাই মনে আসে ওর। পাড়ায় শ্যামলের বন্ধুরা ছাড়াও প্রতিবেশীরাও অনেক সহানুভূতি নিয়েই সব কিছু করেছেন। ডাক্তার ডাকা থেকে শুরু করে শেষ যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সবই প্রায় পাড়ার ছেলেরাই কিনে এনেছে।

কত্তামার কথার শব্দেই রাঙ্গামাসিমা এবার দুই হাত সামনে মেলে ধীরে ধীরে মাথা তোলেন। মানসী একটু সরে দাঁড়ায়। রাঙ্গামাসিমাকে ধরে কত্তামা এবার নতুন করে কান্না শুরু করেন।

কর্তব্য কাজের সব কিছুই এবার ধীরে ধীরে শুরু হবে। সুব্রত বাবার সময় ডাক্তারবাবুর ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে বাড়িতেই থাকতে বলেছিল। সে আবার-বাজার থেকে নতুন কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ওর হাত থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে বাইরে এল মানসী। ওকে জিজ্ঞাসা করেই জানল ভালভাবেই এগিয়ে গেছে সুব্রতরা। কাপড়ের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে একবার রান্নাঘরের দিকে গেল। আজ রান্নাও হয় নি। সকালের সেই চায়ের কাপডিস অমনি পড়ে আছে ছড়িয়ে। সেগুলো গুছিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আবার নিজের ঘরে এসেই ঢুকল মানসী। একটা কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। ভূপতির এই নাটকীয় বিয়ের খবর শুনে রাঙ্গামাসিমা প্রথমেই ওকে কেন দোষী সাব্যস্ত করলেন।

তখনকার ঘটনাটা মনে হতেই একটা বোবা ভয় আবার মানসীকে ঘিরে ধরে। বুকের ব্যথাটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। রাঙ্গামাসিমার মন থেকে মানসীর অপরাধীর ছবিটা মুছে ফেলতে যাওয়াও এখন হাস্যকর প্রচেষ্টা হবে! অথচ মানসী যে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। সে কথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। কারণ তখন সুব্রতর মুখে ভূপতির চিঠিটা শুনতে শুনতেই উনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, এ আমি জানতাম সিতু—এ আমি জানতাম। তোর বউয়ের সংগে ফষ্টি নষ্টি করেই ও ছেলে হাত পাকিয়েছে। তুই তো আর ঘরের বউয়ের দিকে নজর দেবার সময় পাস না। তাই ঘরের কেলেংকারী এ ভাবে বাইরে গিয়ে পৌঁছাল।

রাঙ্গামার—এই ধরনের কথা শুনে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল মানসীর মন। সুব্রতও রাঙ্গামাসিমাকে মানসীর হয়েই কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পাগলের মত সুব্রতর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে রাঙ্গামা এমন বিকট চিৎকার শুরু করলেন। আর তারপরই তো সব প্রহসনের যবনিকা নেমে এল।

না, আর এ সব কথা চিন্তা করতে পারছে না মানসী। এভাবে চুপ করে নিজের ঘরে বসে থাকাটাও তো বেমানান। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর ঘরে মংগলদীপ দেখানোর হয়ত প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঘরের আলোগুলো তো জ্বালতে হবে। তা ছাড়া যে মানুষটা এতবড় একটা শোকে পাথর হয়ে গেছে তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাটাও নৈতিক অপরাধ।

তাই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার খাতাটা বন্ধ করে আবার ধীরে ধীরে রাঙ্গামাসিমার কাছেই গিয়ে দাঁড়ায় মানসী। কত্তামা কি যেন বলছিলেন রাঙ্গামাকে। মানসী সামনে যেতেই এমন এক তীব্র চোখে রাঙ্গামাসিমা তাকালেন ওর দিকে যাতে

আবার কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে খাট থেকে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে থাকে মানসী। লোডশেডিং বোধ হয়। কে যেন দুটো মোম ঘরে জেলে দিয়েছে। মোমবাতির আলোয় ওদের সবার ছায়াগুলো বার বার ঘরের মধ্যে দুলে দুলে একবার করে কাছে এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে।

কত্তামার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে মানসী বলে, আমি তো কিছুই জানি না। আপনি কাছে থেকে সব বলে দেবেন কত্তামা।

মানসীর কথা শেষ হতেই পিছনে সরে বসেন রাঙ্গামাসিমা। তারপর চাপা ক্রোধের সঙ্গে অনেকটা যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলার মতই বলেন,

ওকে এখান থেকে যেতে বলুন কত্তামা। ঘর দোর সব খোলা রয়েছে। ওপরে ঠাকুর ঘরে কাউকে দিয়ে যেন সন্ধ্যে দেখান হয়। আমি ঠিক আছি। যা যা করতে হবে সবই আমি নিজে করব।

রাঙ্গামার কথায় ঘরের মধ্যে প্রতিবেশী যারা ছিলেন একসঙ্গে মানসীর দিকেই তাকায় সবাই। কত্তামা পরিস্থিতি বুঝে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আর কেউ কিছু বলার আগেই মুখে আঁচল চেপে দ্রুত ঘর থেকে বাইরে আসে মানসী। কে কি ভাবল সে ভাবনা আর মাথায় আসে না। রাঙ্গামাসীমার ঘৃণার মুখটাই বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

নিজের ঘরে এসে স্তব্ধ হতবাক মানসী কিছুক্ষণ হাঁপাতে থাকে। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে।

অভিযোগ আর অভিযোগ। ভূপতির সেই নাটকীয় অন্তর্ধানের পর থেকে এ বাড়ির সবাই যেন মানসীকেও ভূপতির সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অথচ কী যে মানসীর অপরাধ সে কথা ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এমন কি রাঙ্গামাসিমার তখনকার কথা শুনে সুব্রতও বোধহয় ওকে ভুল বুঝেছে।

পাড়া প্রতিবেশীদের ফিসফাস গুঞ্জন থেকে শুরু করে রাঙ্গামাসীমার এই এখনকার কথাগুলো পর্যন্ত সব যেন এক সঙ্গে মানসীকে আঘাত করে চলেছে। এক সুরে মানসীর দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে, তুমি—তুমি—তুমিই এ জন্য দায়ী। একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে যেন মানসীর কানে বাজতে থাকে হাজার ঢাকের শব্দ। সবার ধিক্কার আর অভিযোগের কথাগুলো এক হয়ে বিদ্ধ করে মানসীকে।

আর স্থির থাকতে পারে না। এক ঝটকায় বিছানা থেকে উঠে নীচে নামে। নিজের ক্ষত বিক্ষত মনটাকে আর টুকরো করতে না দেওয়ার পণ নিয়েই যেন এবার ধীরে ধীরে টেবিলের কোণ ধরে দাঁড়ায় মানসী। শরীরটাও টলছে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপন মনে বলে ওঠে, না-না-না-আমি নই। সত্যি আমি কিছুই জানি না। ভূপতিকে আমার ভাল লাগত এটা ঠিক। কিন্ত সেই ভাল লাগার মধ্যে ভাল বাসার কোনও স্থান ছিল না।

পড়তে গিয়েই নিজেকে সামলে নেয় মানসী। বাস্তবে ফিরে এসে নিজের কাছেই লজ্জা পায়। এ সব কি বলছে মানসী! কাকেই বা বলছে? মানসী কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? দুই হাতে মাথা চেপে ধরে এতক্ষণে শব্দ করেই কেঁদে ওঠে মানসী।

একটু পরে, কান্নার বেগ কমলে নিজেকে শান্ত করে মানসী। ও ঘরে যাবে কি-না সে কথাও ভাবে। কিন্তু ও ঘরের কথা মনে হতেই রাঙামাসিমার ঘৃণার মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আর সেটা মিলিয়ে যেতেই সকালের সেই চরম অঘটনের ছবিটা বহুক্ষণ পর আবার যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ভেসে ওঠে মানসীর চোখের সামনে। আত্মসমীক্ষার জন্যই আবার সব কিছুই নতুন করে দেখতে থাকে।

আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মুখে বসে থাকার মত, সকালে ওরা যখন, রাঙামাসীমার নীচে নেমে আসার প্রতীক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে নীচে নেমে আসেন তিনি। ঘরের দরজা থেকেই বলেন,

কি রে সিতু, আজ যে এতখানি বেলা অব্দি এ বাড়ির কারও গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না, সব গেল কোথায়। বাড়ি ছেড়ে পালাল না কি?

সব মানে যে মানসী ও সেটা ভাল করেই জানে। সকাল বেলায় এ ধরণের কথা শুনতেও ভাল লাগে না। মানসী তাই সুব্রতর চোখের চাহনিটুকু উপেক্ষা করেই বলে।

না-সব পালাবে কেন? ঘরে ঘরে অমৃত পেঁাছে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই বসে আছে।

কি—কি বললে! সকাল বেলায় একটু চা দিয়ে আস বলে তোমার এত দেমাক! এত অহঙ্কার! বলি আমি কি তোমার বাপের বাড়ির—

সব সময় বাপের বাড়ি বলে কথা বলবেন না আপনি। আমি না হয় আপনাদের কেনা বাঁদী হয়ে আছি। তাই বলে আমার মরা বাপ মা কী দোষ করেছে। আমাকে কথা বলতে গেলেই আপনি যখন তখন তাঁদের টেনে আনেন!

রাঙামাসিমার কথার জবাবে মানসীও তাল ঠুকে বলে। পরিবেশটা অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে দেখেই সুব্রত মানসীর পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে,

কি সব যা-তা বলছ? সকাল বেলাতেই শুরু হল। একটুও ধৈর্য নেই। সব সময় শুধু কথার জবাব দিতে পারাটাই বাহাদুরী নয়। আমি বলছি তুমি এ ঘর থেকে যাও এখন।

সুব্রতর এ কথার কোনও জবাব দেয় না মানসী। ধাক্কা খেয়েও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না। আসল ঘটনার স্বাদটুকু উপভোগ করতেই চায়। কিন্তু তার

ফল যে এত ভয়াবহ হবে সেটা তো কল্পনায় আসে নি। রেগে গেলে মানসীর একগুঁয়েমী আরও বেড়ে যায়। সুব্রত নিজেও সে কথা জানে। কিন্তু এখন এমনই একটা পরিস্থিতি যাতে মানসীকেই সামলে রাখা প্রয়োজন।

মানসীর অনড় ভাব দেখে আর কথা বাড়ায় না সুব্রত। এগিয়ে গিয়ে রাঙ্গামাসিমার হাত ধরে খাটে বসায়। তারপর এক কাপ চা হাতে দিয়ে বলে,

তোমাকে একটা দরকারী খবর দেবার ছিল রাঙ্গামা। তাই আমিই ওকে উপরে যেতে নিষেধ করেছিলাম। সুব্রতর কথায় রাঙ্গামাসিমা কি যে বুঝলেন উনিই জানেন। শ্যামলের দিকে তাকিয়ে এবার বলেন, তুমি আবার এই সাত সকালে কি কথা শুনতে এসেছ? ভাই বৌয়ের কথা শুনলেই তো দিন চলে যাবে।

আবার একটা কথার আঘাত। যদি মানসী এ কথার জবাব দেয় তাহলে আর রক্ষে নেই। শ্যামল তাই একবার মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেই বলে,

কি জান মাদার, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বউ খোঁজার পালা বোধ হয় তোমার শেষ এবার।

আহ্ শ্যামল। সুব্রতর ধমকে জিভে কামড় খেয়ে মাথা নীচু করে শ্যামল। মানসী হাসতে গিয়েও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সুব্রতর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে রাঙ্গামাসিমা ওকেই বলেন,

নাও বল, কি এমন দরকারী কথা তোমাদের। সাতসকালে সবাই একসঙ্গে জোট বেঁধেছ যখন তখন তো শুনতেই হবে সব।

এর পরের ঘটনাটুকু খুবই সংক্ষিপ্ত। ঘটলও দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে। ঘটনাটা যে ভাবে মোড় নিচ্ছিল সে ভাবে, হাল্কা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চললে হয়ত এমন নাও হতে পারত। কিন্তু আজ এ বাড়ির জীবন যাত্রা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে সকাল বেলায় সুব্রতর সেই অল্প কথাগুলোই প্রধান হল।

রাঙ্গামাসিমার কথা শেষ হতেই সুব্রত হঠাৎ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর অনেকটা মুখস্থ পড়ার মত ভূপতির চিঠিটা পড়তে লাগল।

তনিমার সঙ্গে বিয়ের কথা শুনেই রাঙ্গামা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন। আর তারপর পাগলের মত খাট থেকে নেমে সুব্রতর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন চিঠিটা। সমস্ত শরীর তখন তার কাঁপছিল। ঘটনার চমকে মানসীও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিঠিটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ধরে আবার একটা এমন চিৎকার করে উঠলেন রাঙ্গামা যা ওদের সবার চিন্তার বাইরে ছিল।

রাঙ্গামাসিমার সেই প্রচণ্ড চিৎকারের ফলেই বোধ হয় উপর থেকে মেসোমশাই নীচে কোনও অঘটনের আভাষ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই অসমর্থ হলেও স্ত্রীর

গলার সেই প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দ শুনে হয়ত নীচে নেমে আসতে চেষ্টা করেছিলেন মেশোমশাই। বাতে প্রায় অচল দেহটাকে হয়ত লাঠির সাহায্যে কোনও রকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছিলেন। আর অসাবধানে পা ফেলার ফলেই পিছলে পড়ে যান।

এরপরই ঘটনার মোড় দ্রুত অন্যদিকে ঘুরে যায়। গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনে মানসীই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে। সুব্রত আর শ্যামলও ছুটে আসে ঘর থেকে। বুকফাটা আর্তনাদ করে রাঙ্গামাসিমা আছড়ে পড়েন।

কিন্তু তখন বোধ হয় করার কিছু নেই। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে কুণ্ডুলী পাকিয়ে রয়েছেন মেসোমশাই। লাঠিটা ছিটকে পড়েছে উঠোনে। দেহটা শুধু বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। নাক আর কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। চিৎকারের শব্দ শুনেই আশে পাশের লোক জন ছুটে আসে বাড়ির মধ্যে। ডাক্তার হালদারকে ডাকতে ছুটে যায় শ্যামল।

তারপর থেকে এই শেষ যাত্রা পর্যন্ত মানসী সব সময় মেসোমসাইর কাছেই থাকার চেষ্টা করেছে। অতবড় আঘাতের মধ্যেও রাঙ্গামাসিমা কিন্তু মানসীকে দোষী করতে ভোলেন নি। ভূপতির ব্যপারটাও সবাই অল্প বিস্তর জেনেছে।

চিন্তার আর শেষ নেই। এটা এমন এক সমস্যা এসে হাজির হল, যার কোনও সমাধানও মানসীর জানা নেই। ওর একার চিন্তায় হয়ত এতবড় একটা সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব নয়। তবে এখন নিজেকে অনেকটা শান্ত করেছে মানসী। মনে মনে সুব্রতকে নিয়ে অন্য একটা জগতের চিন্তাও করে ফেলেছে। যদিও ওসব কথা এখন চিন্তা করা অন্যায়। তবুও, সবার মন জুগিয়ে ন্যায় অন্যায় বিচার বোধের মাপকাঠিতে জীবনের দিনগুলো নিরিখ করে কি-ই বা এমন সুফল হয়েছে। তার চেয়ে মনের গভীরে যে চিন্তার ছবিগুলো মানসীকে আপাত সান্ত্বনা দিতে পারে সেই ছবিগুলোই ধরে রাখতে চাইছে সে। এখন সুব্রত কি বলবে সেটাই বড় কথা। দুঃখের দানবীয় ছবিটাকে মন থেকে মুছে ফেলার জনাই নিজেকে সংযত করে ধীরে ধীরে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল মানসী।

সুব্রতরা ফিরল প্রায় ভোর রাত্রিতে। ঘাটে গিয়েও একটু দেরী করতে হয়েছিল। কাঠ নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে সামান্য গোলমালও বেধেছিল। পরে অবশ্য আর কোনও অসুবিধে হয় নি। সুষ্ঠ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ব্রজমোহনবাবুর নশ্বর দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মানসীর ইচ্ছে হয়েছিল সুব্রতকে বলে দেয় কিছু ভস্মাবশেষ বাড়িতে নিয়ে এসে তুলসীতলার কাছে একটা বেদীমত করে রাখবে। অনেক বাড়িতেই তো বাবা মার পুণ্য স্মৃতি হিসেবে এ ধরনের বেদী থাকে। কিন্তু কথাটা মনে এলেও বলতে সাহস হয় নি।

সেদিনের পর থেকে রাঙ্গামাসিমা মানসীকে ডেকে আর কথা বলেন না। নেহাৎ প্রয়োজন হলে শ্যামল গিয়ে মানসীকে জানায়। এও এক অসহনীয় অবস্থা। অথচ

করার কিছু নেই। সুব্রতকে এ সব কথা এখন কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া সে তো নিজেই মানসীর এই দুঃসহ পরিবেশ লক্ষ্য করছে। সুব্রত নিজেও যে নিরুপায়। রাঙ্গামাসিমাকেও কিছু বোঝাতে পারে না আবার মানসীকে কিছু বলতে পারে না। একাই সব দিক সামাল দিতে হচ্ছে। বাইরের বাজার টাজার অবশ্যি শ্যামল আর তার বন্ধুরা মিলে করছে। টাকা পয়সাও জোগাড় হয়েছে! অফিসে পঁচিশ দিনের ছুটির দরখাস্ত করেছে সুব্রত। মেসোমশাইয়ের পারলৌকিক কাজ মিটে গেলেও আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়াই উদ্দেশ্য।

অনাদিও ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। এমনিতেই বাড়িতে বিশেষ কথা বলত না। বাবার এই আকস্মিক মৃত্যুতে ও যেন বুড়িয়ে গেছে সবচেয়ে বেশী। সব সময় শুধু রাঙ্গামাসিমার কাছেই বসে থাকে।

ভূপতি, সে রাত্রে আর আসতে পারে নি। তনিমার দাদাও খবরটা পেয়েই ওকে জানাতে পারেন নি। তার পরদিন ভূপতি মাথা নীচু করে বাড়ির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। মানসীই প্রথম দেখতে পায় ওকে। মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কি যেন বলার জন্য এগিয়ে আসে ভূপতি। কিন্তু ওকে দেখেই অন্তরের সমস্ত অভিমান একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মানসী। ছুটে ঘরে গিয়ে সুব্রতকে খবর দেয়। মানসীর কাছে ভূপতির আসার খবর শুনে সুব্রতও প্রথমে চমকে ওঠে। আবার বোধহয় একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। রাঙ্গামাসিমার কথা চিন্তা করেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে সুব্রত। শ্যামল উঠে কলতলায় যাচ্ছিল। সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনাদি [illegible] আর পাশে শুয়ে।

কেউ আর কথা বলতে পারছে না। ভূপতির মানসিক অবস্থা বুঝেই সুব্রত বারান্দা থেকে নীচে নেমে সোজা ভূপতির হাত ধরে বলে, আয়—ঘরে আয়।

বাবার মৃত্যুর খবরটা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি ভূপতি। আবার এই কথা যে নিছক হাসি তামাসার কথাও নয় সেটা বুঝেও কিছুক্ষণ নিজেকে যেন হারিয়েই ফেলেছিল। সারাদিনের আনন্দ আর উত্তেজনার রেশটুকু থাকতে থাকতেই বাগবাজারের নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। তনিমার বৌদি আর দাদাই সব গুছিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটা আপাততঃ কয়েকদিন শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকবে প্রথমে এইটাই ঠিক ছিল। কিন্তু তনিমাই তা মানতে পারে নি। মা তো, তাই সব কিছুর মধ্যেই মায়ের প্রাণ আগে কেঁদে উঠেছে। শেষে শুধু আজকের রাতটা শ্যামবাজারে দাদার কাছে রেখে আসতে স্বীকার করেছে। বন্ধু বান্ধবদের কলকাকলিতে মুখরিত সন্ধ্যাটা ভালই কেটেছিল। নতুন করে কনের সাজে তনিমাকে অদ্ভুত ভাল লাগছিল দেখতে। খাওয়ার ব্যাপারটা সবাই হোটেলেই সেরেছে। সমস্ত দিনের অফুরন্ত আনন্দ আর সুখ অনুভূতির শেষে,

যখন ভূপতি শুধু একান্তভাবে তনিমাকে কাছে পেয়ে ওর ছোট্ট কপালে একটি স্নেহ চুম্বন আঁকতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে বাইরে তনিমার দাদার গলার আওয়াজ পেয়ে দ্রুত ঘর থেকে বাইরে এসেছিল ওরা। তারপর দাদার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই, তিনি ভূপতির হাতে সুব্রতর চিঠিটা এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট্ট সেই চিঠিটা হাতে পেয়েই পড়ে ফেলেছিল ভূপতি। আর তারপর যেন পরিবেশের সমস্ত ঘটনাকে ভুলে তনিমাকে জড়িয়ে ধরে অবুঝ অশান্ত ছেলের মত কেঁদে উঠেছিল। কাল রাতটা বলতে গেলে বিনিদ্রই কেটেছে। হয়ত তখন বাসে করে বাড়িতে ফেরা যেত। কিন্তু তনিমার দাদাই অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন ভূপতিকে। ভূপতিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলেছিলেন, দেখ এখন এভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। যা হবার সে তো হয়েই গেছে। এত রাত্রিতে তুমি যাবেই বা কোথায়? কোন ঘাটে গেছেন ওরা সে তো চিঠিতে লেখা নেই। বাড়িতে এখন যাওয়ার কোন মানে হয় না। হয়ত বা তোমার মা আবার তাতে নতুন করে আঘাত পাবেন। তাই রাতটা কাটুক। কাল সকালেই বরং বাড়িতে যেও।

তনিমাও সেই কথাই বুঝিয়ে বলল আবার। ভূপতি কিন্তু কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না। বার বার ওর নিজেকেই বাবার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মনে হচ্ছিল। অথচ কি করে যে এই অঘটন ঘটল তার কোনও ছবি আঁকতে পারছে না। তনিমার দাদা আবার বুঝিয়ে বলে ফিরে গেলেন। বৌদিকে নিয়ে এখানেই আসতে বলে দিল তনিমা। কারণ একা একা ভূপতিকে সামলে রাখার মত মানসিকতা তনিমাও হারিয়ে ফেলেছিল।

ওর বরাতটাই খারাপ! সুখ হয়ত কপালেই নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। যখনই কোনও আনন্দ আর সুখের ছবি ওর জীবনে এসেছে ঠিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা আঘাতের নিষ্ঠুর কশাঘাত। অনেক সাগর পেরিয়ে তাই ভূপতির সঙ্গে নতুন করে আবার সুখের নীড় বাঁধার শুরুতেই এল এই চরম আঘাত। নিজের ভারাক্রান্ত মনটাকে শান্ত করে ভূপতিকে সান্ত্বনা দিতে থাকে তনিমা।

ভূপতির সঙ্গে তনিমাও টিটাগড়ের বাড়িতে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু দাদা বৌদি ছাড়াও ভূপতি নিজেও অসম্মতি জানাল তাতে। তারপর ছেলেও একটা বড় বাধা। যদি ভূপতির মা এই অবস্থায় ওদের একসঙ্গে দেখে কোনও মন্তব্য করেন তাহলে সেটা সহ্য করা হয়ত তনিমার পক্ষে সহজ নাও হতে পারে। তাই ভোর হতে না হতেই কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ভূপতি একাই চলে এসেছিল। মাথার মধ্যে তখন হাতুড়ি পিঠছে মার সামনে গিয়ে কোন মুখে দাঁড়াবে? বার বার এই একটা চিন্তাই ভূপতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তা সে যাই হোক, বাড়িতে গিয়ে আগে সবার মনের পরিস্থিতি বুঝেই নিজের কথা, সুযোগ পেলে মাকে বুঝিয়ে বলবে। মনে মনে সেই ছকটাই ঠিক করে নেয় ভূপতি। স্টেশনে নেমেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। চেনা মুখ দু' একজনের সঙ্গে দেখাও হল। সামান্য কিছু সহানুভূতির কথা শুনিয়েই তারা অবশ্য ট্রেন ধরতে চলে গেল। ভূপতিরও চেনা মুখ এড়িয়ে যেতেই মন চাইছিল। তাড়াতাড়ি স্ট্যান্ড থেকে একটা রিক্সা ঠিক করে বাড়ির রাস্তাতেই যেতে বলল।

এই পর্যন্ত ঠিকই আসছিল। কিন্তু বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে, ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভূপতি। বাড়ির মধ্যে তখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সদর দরজাটা হয়ত কাজের লোক আসবে বলেই কেউ খুলে রেখেছিল।

মানসীর সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়ায় ভালই লেগেছিল। অন্ততঃ মানসীকে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে সব। শোনাও যাবে হয়ত অনেক কিছু। কিন্তু এখন ফুলদার এসে হাত ধরাতে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না ভূপতি। সুব্রতকে ধরে একটু জোরেই কেঁদে ফেলল।

শ্যামলও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভূপতির কান্না দেখে মানসীও নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আর ওর সেই কান্নার শব্দেই বোধহয় রাঙামাসিমা জেগে ওঠেন। অনাদি গম্ভীর মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব ফুটে রয়েছে ওর মুখে চোখে। একবার অনাদির দিকে তাকিয়েই সুব্রত আবার বলে, কাঁদিস না—আয়—আমার সঙ্গে।

ভূপতিকে নিয়ে নিজের ঘরেই ঢোকে সুব্রত। অনাদি কলতলা থেকে আবার মার কাছে যায়। হয়ত ভূপতির আসার কথা রাঙামাসিমাও বুঝতে পেরেছেন। মানসীকে একটু চায়ের কথা বলে কম্বলের আসন পেতে বসে সুব্রত বলে, কাল খবর পাস নি?

ফুলদার কথার জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে ভূপতি। দুই চোখ জলে ভরে উঠছে আবার। কী-ই বা বলার থাকতে পারে ভূপতির। কাল সকাল থেকে রাত্রিতে বাবার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত সবগুলো ঘটনার ছবি এখন বলতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া বিশ্বাসই বা করছে কে ওর কথা? তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। তবুও কি ভাবে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল সেটা জানবার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে।

মানসী চা করতেই রান্নাঘরে যায়। শ্যামলও একটু দাঁড়িয়ে থেকে উপরে বাবার ঘরেই কেন যেন গিয়ে ঢোকে। কাল থেকে বেশ কয়েকবার ও বাবার এই শূন্য ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের মধ্যে সবই আছে অথচ কী যেন নেই। সেই না থাকাটাই হয়ত খুঁজে বেড়ায় শ্যামলের অবুঝ মন। বাবা বেঁচে থাকা যে কতখানি বড় আশ্রয়, সেটা কাল থেকেই বুঝতে শুরু করেছে ও। মাথার উপরে

যে বটগাছের বড় ছায়াটা ছিল হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ে সেই বটগাছটা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় ছায়াটাও মিলিয়ে গেছে।

ভূপতির এভাবে নিশ্চুপ হয়ে থাকাটা সুব্রতর ভাল লাগছিল না। ও তাই আবার বলে, চুপ করে থাকলে তো চলবে না। তোকেই তো সব কাজ করতে হবে। মুখাগ্নি অবশ্য প্রথমে শ্যামলই করেছে। তবে এখন তো তোকেই সব সামলে নিতে হবে। তাছাড়া রাঙ্গামা—

ফুলদা—মা তোমাকে ডাকছেন। সুব্রতর কথা শেষ না হতেই দরজার সামনে অনাদি এসে দাঁড়ায়। ওর কথা শুনে ভূপতিও মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু ভূপতিকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই অনাদি চলে যায়।

আসন্ন একটা ঝড়ের সংকেত বুঝতে পারে সুব্রত। মানসী চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। চা না খেয়েই উঠে দাঁড়ায় সুব্রত। অনাদির এ ঘরে আসা দেখে মানসীও বুঝতে পারে কিছু। সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, রাঙ্গামা যখন ডেকেছেন ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়েই যাও। বুঝিয়ে বললে হয়ত—।

হ্যাঁ—সে তো যাবই। তবে অনাদিটা আবার গোলমাল না বাধিয়ে বসে। গায়ের শালটা ঠিক করে নেয় সুব্রত। ভূপতির দিকে তাকিয়ে বলে, চল,— রাঙ্গামার কাছে বসেই সব কথা হবে।

সকালে চা না খেয়েই বেরিয়েছিল ভূপতি। মানসীর তৈরী চা খেতেও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো সে কথা বলা চলে না। মাথাটাও ঘুরছে। মা'র সামনে দাঁড়ালে যে আবার কোন পরিস্থিতির সামনে পড়বে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবু সুযোগ যখন এসেছে মার কাছে ফুলদার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক। সুব্রতর সঙ্গেই ঘরের বাইরে আসে ভূপতি।

ওরা বেরিয়ে যেতেই মানসীও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যদিও এখন ভূপতি আর সুব্রতর সঙ্গে ও ঘরে গেলে রাঙ্গামা আবার কিছু বলে উঠতে পারে। তবুও সব জানার আগ্রহটুকু মনে চেপে রাখতে পারছে না। ঘরের অগোছাল বিছানা গুছিয়ে মানসীও পায়ে পায়ে রাঙ্গামাসিমার ঘরের দিকেই এগিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে তখন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। অনাদি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। রাঙ্গামাসিমা ভাবলেশহীন মুখে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছেন। ভূপতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে সুব্রত একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রাঙ্গামার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে, কি হয়েছে রাঙ্গামা? ডাকছিলে কেন?

ভূপতি দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। মানসীও বাইরে, দেখা যাচ্ছে সব কিছুই। একটা ভীষণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। রাঙ্গামাসিমা একবার সবার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই কি যেন বলেন। সুব্রত এবার আর একটু কাছে গিয়ে বলে, ভূপতি এসেছে।

গরম জলে তেল পড়ার মত জ্বলে ওঠেন রাঙ্গামাসিমা সুব্রতর এ কথা শুনে। দুর্জয় ঘৃণা আর ক্রোধের সঙ্গে সুব্রতর দিকেই তাকিয়ে থাকেন একটু সময়। মুখও যেন হঠাৎই লাল হয়ে ওঠে। ওদের দিকে ঘুরে বসে বলেন,

আবার কী নিতে এসেছে এখানে। আমার সব কিছু নিয়েও তৃপ্তি হয় নি ওর। বেরিয়ে যেতে বল ঘর থেকে। ওই মুখ দেখাতে লজ্জা হল না একটু। এই ছেলেকে পেটে ধরেছিলাম আমি।

এইরকম অবস্থাতেও রাঙ্গামাসিমা যে ভূপতিকে এভাবে কথা বলতে পারবেন একথা সুব্রতও ভাবতে পারে নি। ওর মুখে আর কথা জোগায় না। স্থাণুর মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে ভূপতিও। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেছে। মানসী ভূপতির কথা ভেবেই ঘরে ঢুকে ওর কাছে দাঁড়ায়। আর ওকে দেখেই আবার জ্বলে ওঠেন রাঙ্গামাসিমা। সেই একই সুরে বলেন,

তাই তো বলি, সাত সকালেই এভাবে সবাই ঘরে এল কেন? তা শলা পরামর্শ যখন হয়েই গেছে তখন নতুন সংসার গোছাতে লেগে পড় এবার। সঙ্গে না হয় আদরের বৌদিকেও নিয়ে যাও। আমার কাছে কাউকে থাকতে হবে না। কোনও প্রয়োজন নেই আমার।

রাঙ্গামার এবারের কথায় শুধু মানসী নয় সুব্রতরও রাগ হয়। ও তাই মানসীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে,

কেন এভাবে উত্তেজিত হচ্ছো রাঙ্গামা। ভূপতিকে কাল আমিই চিঠি লিখে খবর পাঠিয়েছিলাম। কাল হয়ত বিশেষ কোনও কারণেই অসুবিধায় পড়ে ও সময় মত আসতে পারে নি। রাতও হয়েছিল। তাই আজ সকলেই ছুটে এসেছে। শত হলেও ছেলে তো। অন্যায় যা হয়েছে সেটা তো আর শোধরাবে না। এখন বরং মেসোমশাইর কাজটা কি করলে ভালভাবে হবে সেই কথা বল।

না—ওকে দিয়ে তাঁর কোনও কাজই করানো চলবে না। ছেলে—! যে ছেলে বাবার মৃত্যু ডেকে আনে তাকে ছেলে বলতে আমার ঘেন্না হয়, বুঝলি সিতু আমার ঘেন্না হয়। শত্তুর—তোরা সবাই এক একটা চরম শত্তুর আমার; নইলে—।

রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন রাঙ্গামাসিমা। কথা আর শেষ করতে পারেন না। উপুর হয়ে শুয়ে পড়েন। অনাদি উঠে বসেছে। উপর থেকে শ্যামলও এসে ঢুকেছে ঘরে। পরিস্থিতি বেশ ঘোরাল। অপমানে মানসীর চোখ মুখও লাল দেখাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে কি যে করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছে না সুব্রত।

অনাদি বসে থেকেই হঠাৎ বলে ওঠে,

মার যখন আপত্তি, তাছাড়া আমার নিজেরও অভিমত ওর এখানে না থাকাই ভাল। হয়ত আবার একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে।

কথাগুলো যে ভূপতিকে উদ্দেশ্য করেই বলা সেটা সবাই বুঝতে পারে।

সুব্রতর বেশ রাগ হয় অনাদির এই কথা শুনে। অনাদির দিকে এগিয়ে গিয়েই ও বলে,

তুই কি বলছিস এসব। ভূপতি বাড়ির বড় ছেলে, মেসোমশাইর পারলৌকিক কাজের সব তো ওকেই করতে হবে।

না—হবে না। বড় ছোট বলে কিছু নেই। যে মুখাগ্নি করেছে কাজও সেই করবে। বিছানায় মুখ ঢেকেই সুব্রতর কথার জবাব দেন রাঙ্গামা। এরপর কি বলবে সেটাই ভাবতে থাকে সুব্রত।

শ্যামলই ওকে বাঁচায়। অনাদির কথা শুনে ওরও ভাল লাগে নি। না হয় একটা ঘটনাই ঘটিয়েছে ভূপতি, কিন্তু তার ফলে যে বাড়িতে এমন বিয়োগান্ত নাটক শুরু হবে সেটা ও জানত না। তাছাড়া বাবার মৃত্যুর জন্য ওকে দায়ী করতে যাওয়া কেন? মানসীর কাছে দাঁড়িয়ে শ্যামল বলে,

তা হলে কি মেজদা এ বাড়ি থেকে চলে যাবে এখন। এই খবর শুনে তাই কি করতে পারে কেউ।

শ্যামলের কথা শুনে আবার বিছানায় মুখ তুলে বসেন রাঙ্গামাসিমা। তারপর ওদের সবার দিকে তাকিয়ে সেই একই সুরে বলেন,

থাকবে কি চলে যাবে সেটা আমার জানার কথা নয়। আমার সোজা কথা ওঁর কোনও কাজে ও থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে তো বেরিয়েই গেছে। ওই কালো মুখ সবাইকে দেখিয়ে আর কোন পুণ্যি হবে।

অনেকক্ষণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে ভূপতি। এমনিতেই ভাবপ্রবণ ও। তারপর কাল রাত থেকে শুধু আঘাতের কষাঘাতই গায়ে লাগছে। খুব বেশী আঘাত পেলে মানুষ যেমন একদিকে বোবা হয়ে যায়। আবার অপর দিকে বিদ্রোহীও হয়ে ওঠে। চিরদিনের ভাল মানুষ সহজ সরল মানসিকতায় গড়ে ওঠা ভূপতিও এক সঙ্গে এতগুলো কথার আঘাত আর দাঁড়িয়ে থেকে সহ্য করতে পারছিল না। একবার মানসীর দিকে তাকিয়ে ও সুব্রতর দিকে এগিয়ে ধীর শান্ত গলায় বলে,

আমি চলেই যাচ্ছি ফুলদা। অনাদি ঠিকই বলেছে, আমি এখানে থাকলে হয়ত আবার কোনও অঘটনই ঘটে যাবে।

কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ায় না। শ্যামলকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যায়। ঘরের মধ্যে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুব্রত। মানসীও কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে। শ্যামল ভূপতিকে ডাকতেই চায় কিন্তু সুব্রতই ওকে নিষেধ করে। সমস্ত পরিস্থিতি এখন ওকেই সামাল দিতে হবে। নতুন করে আবার চিন্তার জট পাকাতে শুরু করে মাথায়। মানসীও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ঘরদোড় সব দেখতে হবে। ওদের জলখাবার দিতে হবে।

শ্যামল আবার উপরের ঘরেই চলে যায়। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুব্রত নিজের মনেই এর পরের অধ্যায়ের কল্পনা করে নেয়। রাঙ্গামাসিমাও আর কথা বলছেন না। নিরবতা ভেঙ্গে সুব্রতই বলে,

আমি তাহলে এখন যাই। ঠাকুরমশাই সকালেই আসবেন আজ। ফর্দ লিখে সব ব্যবস্থা তো শুরু করতে হবে।

যা ভাল বোঝ কর। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। রাঙ্গামা নির্লিপ্ত ভাবেই জবাবে দেন। অনাদি মাথা নীচু করে বসে আছে। ওর সঙ্গে এখন আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় সুব্রত।

দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে আসে। সেদিনের সেই ঘটনার পর ভূপতি আর আসে নি। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। আত্মীয় পরিজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই ওর কথা জিজ্ঞসা করছেন। এক একজনকে এক এক রকমের মনগড়া জবাবও দিতে হচ্ছে মানসী আর সুব্রতকে। শ্যামল দু'বার গিয়েছিল ভূপতির বাসায়। সুব্রতই ওকে জোর করে পাঠিয়েছিল সবার অজ্ঞাতে। এমন কি কথাটা মানসীও জানে না। কিন্তু ভূপতি নাকি তনিমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করেছে বাবার পারলৌকিক কাজ ওর সাধ্যমত সেখানেই করবে। অশৌচও পালন করছে। ভূপতিকে বোধহয় আর কিছুতেই বোঝানো যাবে না। হয়ত নরম মনের মানুষ ভূপতি একটু সহানভূতির সুর পেলে সব কিছুই মানিয়ে নিত। কিন্তু রাঙ্গামাসিমার যে রকম অনড় একগুঁয়ে মনোভাব। সেখানে আর ভূপতির কথা তোলাই চলে না।

ঘাট কামানোর দিন আবার আর এক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল মানসীকে নিয়ে। সুব্রতই বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। সবার সঙ্গে মানসীও গঙ্গার ঘাটে যেতে চেয়েছিল। অপরাধ এইটুকুই। রাঙ্গামা মানসীর যাওয়ার কথা শুনেই রেগে আগুন। বাড়িতে লোকজনের উপস্থিতির কথা ভুলেই. চিৎকার করে উঠলেন, তা হলে তোরাই বউ নিয়ে আনন্দ করতে যা। আমি না হয় পুকুরেই ডুব দিয়ে উঠব।

রাঙ্গামাসিমার কথা শুনে রাগে ফেটে পড়েছিল মানসী। পরিবেশ ভুলে মানসীও মুখিয়ে উঠেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ—আনন্দই তো। স্বামী নিয়ে আনন্দ করেই তো দিন কাটছে আমার।

কী হচ্ছে কি ? এত অসভ্য হয়েছ তুমি।

হ্যাঁ হয়েছি। আর আমাকে অসভ্য ইতর বানিয়েছ তুমি—তোমরা সবাই। সুব্রতর ধমকেও চুপ করে না মানসী। রাগে থর থর কাঁপতে থাকে শুধু। শেষে ওকে হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে এনে শান্ত করে সুব্রত। বেলা হয়ে যাচ্ছে। রিক্সা এসে গেছে বাইরে। ঠাকুরমশাইও তাড়া দিচ্ছেন। ঘরে এসে সুব্রতর

কথায় কিছুটা শান্ত হয় মানসী। অনেক কথার সঙ্গে সেদিনই সুব্রত প্রথম বলে, মেসোমশাইর কাজটা ভাল ভাবে মিটে গেলেই ও মানসীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। সুব্রতর এ কথাতেই বেশ কাজ হয়। আর কথা না বাড়িয়ে বাড়িতে থেকে সব কাজ দেখার কথাই মেনে নেয় মানসী।

এই ভাবে ছোট ছোট মানসিক অশান্তির মধ্যেই দিন কাটে। মানসীর বিক্ষুব্ধ অশান্ত মনটা কাজের মধ্যে থেকে কিছুটা শান্ত হলেও রাঙ্গামাসিমার এই ওকে দেখে অসহনীয়তা কিছুতেই মানতে পারে না মানসী। সুযোগ পেলেই লোকজনের সামনে মানসীকে কথা শোনান রাঙ্গামা। সুব্রতকে বলতে গেলে এসব শুনতেই চায় না। ওর সময়ও নেই। চারদিকে এখন শুধু কাজ আর কাজ।

পারলৌকিক কাজের দিন আর বিশেষ কোনও ঝামেলা হয় নি। মেসোমশাইর বড় এনলার্জ করা ফটোটা ভাল করে বাঁধিয়ে এনেছিল শ্যামল। চন্দন দিয়ে মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছিল মানসী। শ্রাদ্ধ বাসরের মাঝখানে ফটোটা দেখে মনে হচ্ছিল মেসোমশাই যেন মুখ টিপে হেসে মজা দেখছেন। শ্মশান বন্ধু ছাড়া অতিথি অভ্যাগত আর আত্মীয় স্বজনও অনেক এসেছিলেন। কোনও ত্রুটিই রাখে নি সুব্রত। টাকার তো অভাব নেই। তাই কাজের যেন কোন খুঁত না থাকে! বার বার রাঙ্গামাসিমার অভিমত নিয়েই সব কিছু কেনা কাটা করেছে। মেসোমশাইর বন্ধুস্থানীয় কয়েকজনও দুপুরের দিকে এসেছিলেন। তারা রাঙ্গামা আর সুব্রত অনাদিদের সান্ত্বনা দিয়ে কাজের প্রশংসাই করে গেছেন। মানসীরও নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। ভাঁড়ার ঘর সামলানো থেকে শুরু করে সবাইকে সব কিছু এক হাতেই বলতে গেলে জুগিয়ে যেতে হচ্ছিল। এতটুকু ক্লান্তি আসেনি ওর কাজ করতে। শুধু শ্রাদ্ধ বাসরে গেলে কান্নায় ভরে উঠেছে মুখ।

টুলুপিসিমা দু'দিন আগেই এসেছিলেন। তিনি আসাতে মানসীও বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ভূপতির কথা এখন সবাই জানে। টুলু পিসিমাও ওর এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি। ঠাকুরের কাজ আর শ্রাদ্ধের সব জিনিসপত্র টুলুপিসিমাই ঠিকমত গুছিয়ে দিয়েছিল। ওদিকে মানসীর কিছু করতে হয় নি।

সব কিছুই সুষ্ঠভাবে মিটে গেল। এখন আর কোনও ঝামেলা নেই। কাজের দুদিন পর আবার এক কাণ্ড বেধেছিল। সুব্রতরও আর এসব ঘটনায় বার বার নিজেকে জড়াতে ভাল লাগছিল না। ভূপতির কথা উঠলেই কেন যে রাঙ্গামা মানসীকে নিয়ে টানাটানি করেন কিছুতেই বুঝতে পারে না সুব্রত।

টুলুপিসিমার কাছে ক'দিন থাকার কথা সুব্রতই বলেছিল মানসীকে। শরীরের ওপর যা ধকল গেল। তা ছাড়া মন বলেও তো একটা জিনিস আছে। রাত্রে শুয়ে সুব্রতর কথা শুনে মানসী বলেছিল,

কেন তুমি যাবে না সঙ্গে ?

এখন কি আমার যাওয়া চলে। রাঙ্গামা কি ভাববেন ?

ওঁর ভাবনা এখন ওকেই ভাবতে দাও। তুমি তোমার নিজেরটা ভাবতে শেখ বুঝলে।

ছিঃ মানসী রাঙ্গামার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলো না। উনি না থাকলে কোথায় ভেসে যেতাম আমি জান কি ?

জানি জানি সব জানি। ওসব কথা শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। আর ভাল লাগে না। আমারও শখ আহ্লাদ বলে কিছু থাকতে পারে।

তার কোনটা অপূর্ণ আছে বল ?

আহা কি আমার পুরুষ রে। যারা স্ত্রীর অপমান সহ্য করে পরের কাছে মাথা নীচু করে থাকে তাদের আবার বড় বড় কথা।

মানসীর এ কথায় ভীষণ রাগ হয় সুব্রতর। অবাক হয়ে ও তাকিয়ে থাকে মানসীর মুখের দিকে। কত ছোট হয়ে গেছে মানসী। রাঙ্গামাসিমার সম্বন্ধে কোনও রকমের বেহিসেবী কথাই আর ওর মুখে আটকায় না এখন। আর এখন ওকে কোনও কথা বলতে যাওয়াও মূর্খামী। বিছানা থেকে নীচে নেমে এক গ্লাস জল খায় সুব্রত। তারপর গম্ভীর ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে,

তুমি যতই গালাগাল দাও, এখন আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। টুলু-পিসিমাকে তো আমি বলেছি। তিনি রাঙ্গামাকে বলে ব্যবস্থা করবেন। তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে ক'দিন থাকবে সেখানে।

সে আমি জানি। তোমার দৌড় তো জানা ছিল আমার। সেই কথাই বলছি। পিসিমা আমার যাওয়ার কথাই বিকেলে একবার বলেছিলেন। তাতে উনি যা মুখে এল শুনিয়ে দিলেন।

মানসীর এ কথা শুনে বিছানায় এসে বসে সুব্রত। ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি আবার কথা শোনালেন রাঙ্গামা।

নতুন আর কি! আমি অপয়া। আমি এ বাড়িতে আসার পর থেকেই না কি সব কিছু খারাপ হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি যাই ততই ভাল। তার নিজের ছেলেও নাকি আমার জন্যই পর হয়ে গেল। সত্যি বলছি—আমি আর পারছি না এ ভাবে থাকতে। তুমি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা কর এবার।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে সুব্রতর বুকে মাথা লুকিয়ে কান্না শুরু করে মানসী। এ রকম যে ঘটবে সেটাও সুব্রত জানত। কিছুদিন হলই এই রকম হঠাৎ রেগে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে মানসী। ওর যত রাগ অভিমান সব সুব্রতর উপর। অবুঝ ছেলেমানুষ এই মেয়েটির উপর তাই রাগ করাও চলে না। সব বুঝেও অসহায় ভাবে শুধু মানসীর মাথায় হাত বোলাতে থাকে সুব্রত।

মনে মনেই ঠিক করে নেয় মানসীকে নিয়ে ছুটি থাকতে থাকতে ক'দিন কোথাও ঘুরেই আসবে। যদি এর জন্য রাঙ্গামাকে কিছু বলতেও হয় তা হলে বলবে।

টুলুপিসিমার সঙ্গে আর যাওয়া হয় নি মানসীর। তা ছাড়া ও নিজেও ভেবে দেখেছে পরে, এখনই এ ভাবে ওদের দু'জনার এক সঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। টুলুপিসিমা বুঝিয়ে বলাতে রাঙ্গামাসিমা অবশ্যি সেদিন মানসীর সামনেই বলেছিলেন, তা ও যদি যেতে চায় যাক না। ক'দিন ঘুরে আসুক। ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করে দিতে পারব।

হয়ত মনটা ভাল ছিল ; আর না হয় আগে যেমন মানসীকে কাছে বসিয়ে মেয়ের মত আদর যত্ন করে কথা বলতেন সেই মনটাই ফিরে এসেছিল কিছু সময়ের জন্য, তাই মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবেই কথা বলছিলেন রাঙ্গামা। কিন্তু মানসী নিজেই হেসে টুলুপিসিমাকে বলেছে,

না পিসিমা এখন কি আমার বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া চলে। পরে বরং আপনার ছেলের সঙ্গে গিয়ে ক'দিন থাকব।

সে বাছা তোমাদের যা ভাল মনে হয় তাই করো। আমি তো আর থাকতে পারবো না, ওদিকে আমার বাড়িতে যে কি হচ্ছে কে জানে।

টুলুপিসিমা হয়ত একটু রাগই করলেন মানসীর কথা শুনে। কারণ রাঙ্গামাসিমাকে যাওয়ার কথা বলতে শুধু সুব্রতই নয় মানসীও বলেছিল। তবুও পিসিমাকে আড়ালে বুঝিয়ে আবার সব বলেছিল মানসী।

বাড়ির সমস্ত পরিবেশটাই যেন ব্রজমোহনবাবুর মৃত্যুতে ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাছের মানুষগুলো সব যেন এক এক করে দূরে সরে যাচ্ছে। এক দুই করে এক মাস কেটে গেছে। সুব্রত এখনও অফিসে জয়েন করেনি। অনাদি কুড়ি দিনের ছুটি নিয়েছিল। সে নিয়মমতই অফিস করছে। তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে ওর সম্পর্কও খুব একটা নেই। তবে বাবার মৃত্যুতে একটা নতুন পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে। আগের মত খুব একটা রাজনীতির মধ্যে আর নিজেকে জড়িয়ে রাখে না। মিউনিসিপালিটির ইলেকশানে ও কোনও ভূমিকাই নিতে পারে নি! হয়ত সে একটা আঘাত হতে পারে। আবার রাঙ্গামাসিমাও ইদানিং অনাদির সঙ্গেই ঘর সংসারের কথা বেশী বলেন। তাই বাড়িতে বেশির ভাগ সময় মার কাছেই থাকে অনাদি। পার্টটাইমের অফিসেও খবর দিয়েছিল সুব্রত। সেখানেও ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে।

জবার সঙ্গে মানসীরও পরিচয় হয়েছে এই সুযোগে। কারণ ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যখন অফিসে এল না সুব্রত। তখন জবাই একদিন খোঁজ করে এ বাড়িতে এসেছিল। ওকে দেখে প্রথমে তো কিছুই বুঝতে পারে নি মানসী। বাইরে থেকে সুব্রতর নাম ধরে ডাকছিল। শ্যামলই এগিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর সুব্রতকে ডেকে জবার কথা বলেছিল।

প্রথম দিনেই ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে, সুব্রতর মুখে যা যা শুনেছিল ঠিকই তাই। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়েই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল জবাকে। অনেকদিন পর সেদিন প্রাণ খুলে হেসে কথা বলেছিল মানসী। জবার হাতেই আর কয়েকদিনের ছুটি বাড়িয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সুব্রত।

তারপরও জবা কয়েকদিন এসেছে। অফিস ছুটির আগেই বড় সাহেবকে বলে এখানে আসত। গল্পে গল্পে রাতও হয়ে যেত ফিরতে। যা দিন কাল পড়েছে রাত্রে একা একা যাওয়াটা নিরাপদ নয় ভেবেই সুব্রত ওকে আর আসতে নিষেধ করেছিল। জবা সে কথা শুনে হাসতে হাসতে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,

দেখলেন তো বৌদি, দাদা কতখানি ভালবাসে আপনাকে। ছুটির দিনগুলো বাড়িতে শুধু আপনাকে নিয়েই কাটাতে চায়। অন্য কারও আসাই চলবে না।

আরে না-না সে কথা নয়। ভীষণ ফাজিল হয়েছ তো জবা। আমি কি তাই বললাম।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জবা বলে, বললেনই তো! একা একা কি আমি রাত্রে কোথাও যাই না। আপনিই বলুন তো বৌদি!

মানসী না হেসেই বলে, আমি আর কি বলব ভাই। শুধু দেখে যাচ্ছি। ভালবাসার নমুনা দেখতে দেখতে তো বুড়িয়ে গেলাম। এখন তোমার সঙ্গে গল্প করে একটু মন ভাল করছিলাম তাতেও উনি বাদ সাধছেন।

হাসি ঠাট্টার মধ্যেই উঠে পড়ে জবা। সুব্রত ওকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসে। জবাকে নিয়ে অনাদির সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাবার কথাও ওর চিন্তায় মাঝে মাঝে আঘাত করে। মানসীকে একদিন কথাটা বলেও ফেলে। কিন্তু প্রবল বেগে মাথা নেড়ে মানসী বলে, না বাবা আবার এসব বিয়ের ব্যাপারে জড়িও না নিজেকে। ও'র ছেলেদের ব্যাপার ও'কেই বুঝতে দাও।

মানসীর যুক্তিও ফেলনা নয়। কারণ সুব্রত দেখছে। ইদানিং রাঙ্গামাসিমা ওকে কাছে ডেকে কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। অনাদির মুখেই যা শোনে। তবে সুব্রত জানে, আর যাই মনে থাকুক রাঙ্গামা ওকে কখনো ভুল বুঝবেন না। এত বড় একটা বিপদ গেল। তাই পর পর মানসিক আঘাতে রাঙ্গামা হয়ত একটু অন্যরকম হয়ে পড়েছেন। সময়ের প্রলেপে মন শান্ত হলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিপদ কখনো একলা আসে না, প্রচণ্ড বর্ষণের সঙ্গে যেমন ঝড়ের মাতামাতি থাকে, তেমনি মানুষের দুঃখের অসহনীয় মুহূর্তগুলো একের পর এক বিভিন্ন আঘাতের রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সহ্যশক্তির সব বাঁধনগুলো যখন খসে পড়ে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তখনও নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতগুলো মানুষকে রেহাই দেয় না। পুতুল নাচের পুতুলের মত মানুষ তখন অসহায় ভাবে দুর্জ্ঞেয় সেই নিয়তির বিধানকে কখনও মাথা পেতে সহ্য করে; আবার কখনও

নিষ্ফল আক্রোশে এমন কিছু করতে চায় যাতে দুঃখের বোঝা আরও ভারি হয়ে চেপে বসে। ভাঙ্গাগড়ার এই একই খেলার মধ্যে প্রতিনিয়ত মানুষকে চলতে হচ্ছে।

সুব্রতর কাছে আশ্বাসের কথা শুনে সব কিছু চুপ করে মেনে নিয়েই দিন কাটাছিল মানসীর। রাঙ্গামাসিমার আঘাতের কথাগুলোও আর মনে ধরে রাখতে চাইত না। শ্যামলের সঙ্গেই এখন সুখ দুঃখের কথা কিছু কিছু বলত। শ্যামলও আর আগের মত বাইরে ঘুরে সময় কাটায় না। ওর মধ্যেও একটা বড় পরিবর্তন এসেছে মেসোমশাইর মৃত্যুর পর। শ্যামল ঠিক করেছে প্রাইভেটেই পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। সংসারের এই রকম অবস্থায় ওকে নিয়ে যাতে আর কোনও অশান্তি না ঘটে সেটাই চিন্তা করেছে শ্যামল, বইও কিছু জোগাড় করেছে। উপরে মেশোমশাইর ঘরেই এখন থাকে শ্যামল। রাঙ্গামাসিমাও আগের মত ওপরে শোন। সুব্রতর ছুটির আর চারদিন বাকি। সামনের সোমবারই জয়েন করবে।

হঠাৎই সেদিন বিকেলে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যাতে শুধু মানসীই নয় সুব্রতরও এতদিনকার সাজানো অঙ্কে গোলমাল হয়ে গেল। সব কিছু চিন্তা-ধারা একটা সন্ধ্যার ছায়া ছায়া অন্ধকারে ভেঙ্গে ধুলোয় গুঁড়িয়ে গেল।

সুব্রত সকালেই বলেছিল বিকেলে ও একটু কলকাতায় যাবে। মানসীও যেতে চেয়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সুব্রত ওকে নিতে চায় নি। কাজ তো কিছু নেই। সুব্রতর ইচ্ছে ছিল ও নিজেই একবার ভূপতির বাসায় গিয়ে আবার নতুন করে সব বুঝিয়ে বলবে। রাঙ্গামাসিমার মনটাও এখন শান্ত হয়েছে। ভূপতির কথা উঠলে আর আগের মত, চটে ওঠেন না। বরং কথা শুনে মনে হয় ভূপতি যদি সামনে এসে দাঁড়ায় এখন, তাহলে হয়ত ওকে ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখবেন রাঙ্গামা। তাই মনে মনে একটা শুভ প্রচেষ্টার ছক কষে তারই প্রথম পদক্ষেপের দিকেই পা বাড়াতে ইচ্ছে হয় সুব্রতর। মানসীকে সংগে নিলে অন্য কিছু নয়, পরে জানাজানি হলে হয়ত আবার রাঙ্গামা কিছু ওকে বলে বসতে পারেন। তাই ওকে সংগে নিতে চায় না সুব্রত।

দুপুরে অল্প একটু ঘুমিয়েই উঠে পড়ে! মানসী শুধু জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় এই বিকেলে আবার কোথায় যাচ্ছ।

সুব্রত হেসেই ওর দিকে তাকায়। তারপর বলে, ভয় নেই, সিনেমা থিয়েটারে যাচ্ছি না।

আহা গেলেই বা বাধা কোথায়-। তা আমাকে বললে কি ক্ষতি হবে সে কাজের।

মানসীর কথা শুনে মজাই পায় সুব্রত। জামা গায়ে দিতে দিতে বলে,

না ক্ষতি হবে না তবে বাধা তো আসতে পারে।

আমি তো তোমার জীবনে বাধা হয়েই শুধু আছি। তা এ আপদটাকে

ঠেলে ফেলতেও তো পারছো না। কথা বলে উঠে পড়ে মানসী। সুব্রত বলে, একটু চা করবে।

সুব্রতর কথার জবাব না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মানসী। রাঙ্গামাসিমাও শ্যামলের সংগে উপরের ঘরে রয়েছেন। শ্যামলের আবার দু'দিন হল একটু জ্বর হয়েছে। ভাত খাচ্ছে না। এই আর এক ছেলে। সামান্য একটু মাথা ব্যথা বা জ্বর হলেই ছেলেমানুষের মত কান্না শুরু করবে। একটুও সহাশক্তি নেই। কিছুই খাবে না। শুধু বার বার চা চাই। ওকেও চা দিতে হবে।

রান্নাঘরে বসে নিরবে চা তৈরীর কাজেই মন বসায় মানসী। চা খেয়ে আর একটু বসেই উপরে যায় সুব্রত। রাঙ্গামাসিমাকে হয়ত বলতে গেল। কচি খোকা বাড়ি থেকে বাইরে বেরতে গেলেই রাঙ্গামার অনুমতি নিতে হবে। এ সব এক ধরনের আদিখ্যেতা। কিন্তু মানসীর ভাল লাগা না লাগতে সুব্রতর কিছু এসে যায় না। ছোটবেলা থেকে যাঁকে মায়ের আসনে বসিয়েছে তাঁর কথার মূল্য সবার উর্ধ্বে।

সুব্রত বেরিয়ে যেতেই বাইরের দরজাটা বন্ধ করে ঘরে আসে মানসী। দু'কাপ চা নিয়ে উপরের ঘরে যায়।

শ্যামল চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। রাঙ্গামাসিমা বই পড়ছেন। মানসীকে দেখে বই বন্ধ করলেন। চায়ের কাপ হাতে দিয়ে-শ্যামলের কপালে হাত দেয় মানসী। মানসীর হাতের স্পর্শেই তাকায় শ্যামল। উঠে বসে বলে, কই চা এনেছ?

টেবিল থেকে শ্যামলের কাপটা এগিয়ে দিয়ে পাশে বসে মানসী। রাঙ্গামাসিমা চা খেয়েই বিছানা থেকে নেমে পড়েন। অন্যদিন মানসীর হাতেই কাপডিস এগিয়ে দেন। আজ নিজেই হাতে করে চললেন। মানসী তাড়াতাড়ি নেমে হাত বাড়িয়ে বলে, আমার কাছে দিন রাঙ্গামা ঠাকুরপোর খাওয়া হলে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

থাক—আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তোমার আদরের ঠাকুরপোর তো তুমি কাছে এলে আর অসুখ বিসুখ থাকে না। আমি কাছে থাকলেই বরং উঃ আঃ করে কাতরাবে। তাই আমিই নীচে যাচ্ছি তুমি ওর কাছে বসে গল্প কর।

কথাগুলো বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যান রাঙ্গামাসিমা। সামান্য কথাই কেমন পেঁচিয়ে বলেন উনি! এ কথার জবাব দিতে গেলেই একটা কান্ড বেধে যাবে। ধীরে ধীরে আবার শ্যামলের কাছেই এসে বসে মানসী। ওর এক একসময় ভীষণ ভয় করে। রাঙ্গামাসীমা যখন এইভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলেন, তখন প্রথমেই মানসীর ভয় হয় এই বুঝি কোনও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে ও। আর তার ফলে সুব্রতর সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মেসোমশাইর মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে অনেক শক্ত হাতে বেঁধে কথা বলায় চেষ্টা

করে মানসী। তবুও সব সময় সে মন তো থাকে না। এই যেমন এখনই একটা রূঢ় কথা মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল। রাঙ্গামাসিমা নীচে চলে যাওয়াতেই আর কোনও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারল না।

চা খেয়ে কাপটা মানসীর হাতে তুলে দিয়ে শ্যামল বলে,

তোমার কি রাশি বলত ম্যাডাম ?

শ্যামলের কথা বুঝতে না পেরেই ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকায় মানসী। শ্যামল বালিসটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে বলে, একেবারে গেঁইয়া, কথাটা ধরতে পারলে না তো।

এবারেও মাথা নাড়ে মানসী। শ্যামল ওর একটা হাত নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে,

বলেছিলাম তোমার কোন রাশি ছিল। মাদারের তো বৃশ্চিক—তোমার কোনটা তাই জানতে চাইছি। কারণ বৃশ্চিক আর কর্কট এক জায়গায় হলেই নাকি তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। ওই শনি রাহুর মত ব্যপার আর কি ? তা তোমার কর্কট নয় তো ম্যাডাম।

জানি না যাও। রাশি নক্ষত্রের মিল করে তো আর তোমাদের বাড়িতে আসিনি। আগে জানলে না হয় সেই মত ব্যবস্থা করতে বলতাম। যত সব ফাজিল। নাও হাত ছাড় আমি যাই দেখি আবার নীচে কি হচ্ছে। কাজের লোকও তো এখনও আসে নি। শ্যামলের কাছ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মানসী। নীচে কত্তামার গলার শব্দ শোনা যায় ! কত্তামা হয়ত রাঙ্গামাসিমার কাছেই এসেছেন। প্রায়ই বিকেলে এসে কিছুক্ষণ গল্প করে যান। এতে রাঙ্গামার মনটাও ভাল থাকে। তাই এখন নীচে নামলে ওকে দেখে যদি আবার কিছু কথা বলেন রাঙ্গামা তাহলে হয়ত মানসী চুপ করে নাও থাকতে পারে। তাই নীচে নামার কথা বাদ দিয়ে আবার ঘুরে শ্যামলের কাছে এসেই বলে,

তোমার তো এখন জ্বর নেই। এ বেলায় কি রুটি খাবে।

না বাবা ও সব রুটিফুটি আর ভাল লাগে না। ভীষণ মাথার যন্ত্রণা করছে। যদি পার পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে—একটু মুড়ি বরং মেখে দিও।

রাত্রে পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি! ও আমি দিতে পারব না। শ্যামলের পাশে আবার বসে বলে মানসী। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল হেসে ফেলে, মানসীর দুঃখের সব ছবি শ্যামলও বুঝতে পারে। কিন্তু করার তো কিছু নেই ওর। মা যে কেন শুধু শুধু এভাবে কথা শোনায় তারও কোনও হদিশ পায় না। তবে মানসীর দুঃখের সবচেয়ে বড় দিক যেটা তা শ্যামল জানে। প্রতিটি মেয়েই বিবাহিত জীবনে সুখী সংসারের ছবি দেখে। আর সেই সুখের প্রথম কথাই হল 'মা' হওয়া। মানসীর জীবনে সেই জায়গাতেই একটা চরম পরাজয় ঘটেছে।

আর যার ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত জীবন ধারাই বদলে যাচ্ছে ওর। মানসীর মনকে হাল্কা করার জন্যই শ্যামল আবার ওর একটা হাত ধরে বলে,

অনেকদিন সিনেমা দেখি না। জ্বর তো ছেড়েই গেছে। আজ আর হবে না। কাল একটু ফুলদাকে বলে ম্যানেজ করনা। চল দু'জনে সিনেমা দেখে আসি।

তবেই হয়েছে। সিনেমা দেখার কথা তোমার ফুলদাকে আমি বলতে পারব না। আর মাকে তো আমার চেয়ে তোমরাই ভাল জান।

তোমার মন ভাল যাচ্ছে না তাই বললাম। আমার তো বাইরে বেরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যাকগে সে কালের কথা কাল ভাবা যাবে। ফুলদা হঠাৎ এখন কলকাতায় গেল কেন বল তো? কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় শ্যামল।

মানসী মাথা নীচু করে বলে, কি জানি আমাকে তো বলে না কিছু। হয়ত কোনও বন্ধুর কাছে গেছে।

না বৌদি আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। না হলে এই অবেলায় ফুলদা কলকাতায় শুধু বন্ধুর কাছে গল্প করতে ছুটবে না। আচ্ছা মেজদার বাসায় যাবে না তো?

শ্যামলের কথায় চমকেই তাকায় মানসী। সত্যিই তো ভূপতির বাসায়ও যেতে পারে সুব্রত। ক'দিন আগে হঠাৎই মানসী ভূপতি আর তনিমার-কথা জিজ্ঞাসা করায় সুব্রত বলেছিল একটা মিটমাট করে দেওয়া দরকার। রাঙ্গামাও তো মনে মনেই শুধু নয়,—এখন মুখেও ওদের কথা সবার কাছে বলেছেন। কথাটা মনে হতেই এতক্ষণ পরে আবার নতুন করে রাগ হল সুব্রতর ওপর। ওকে নিয়ে গেলে কী এমন ক্ষতি হত। বরং ভূপতিকে বুঝিয়ে বাড়িতে আসার কথা মানসী বললে সে নিশ্চয়ই ফেলতে পারত না। তনিমাকেও দেখা হত। সঙ্গে ওর ছেলেটাকেও একটু আদর করে আসা যেত। শ্যামলের কাছেই শুনেছিল মানসী। তনিমার ছেলেটা নাকি ভারি সুন্দর দেখতে। খুব ফর্সা গোলগাল এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। ঠিক সেই মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেসে যে রকম বাচ্চা ছেলের ছবি দেখেছিল সেই রকম। অব্যক্ত একটা ব্যথায় বুকের ভেতরটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে মানসীর।

সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়। এতক্ষণ উপরে বসে আছে। নীচে রাঙ্গামা কি ভাবছেন কে জানে? কর্তামার গলার আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না। কলতলায় বাসনের শব্দ শুনে মানসী বুঝল কাজের লোক এসেছে। এত দেরী করে কাজ করতে আসে না। বললেও শুনতে চায় না। ঠিকে ঝিয়ের এই এক ঝামেলা।

শ্যামলের কথার জবাব না দিয়েই উঠে পড়ে মানসী। ওর এই হঠাৎ ভাবান্তরের মানে শ্যামলও বুঝতে পারে না। দু'দিনের জ্বরে শরীরটাও দুর্বল হয়ে

পড়েছে। আবার দুপুর থেকে এমন মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে বলার নয়। চা খেয়ে সামান্য একটু কম ছিল। এখন আবার কানের পাশে দপদপানি শুরু হয়েছে। মানসীকে দাঁড়ান দেখে ও তাই আব্দারের সুরেই বলে,

আমার মাথাটা একটু টিপে দাও না বৌদি। ভীষণ যন্ত্রণা করছে।

ওর কথায় ঘুরে বলে মানসী, তবেই হয়েছে নীচে রান্নার কাজ পড়ে আছে। এখন বসে তোমার মাথা টিপলে আর রক্ষে থাকবে না আমার।

প্লীজ বৌদিভাই একটু হাত বুলিয়ে দাও। সত্যি খুব ব্যথা করছে এখানটায়। দুই হাত দিয়ে কানের পাশ টিপে ধরে করুণ চোখে মানসীর দিকে তাকায় শ্যামল। মানসীর কেমন কষ্ট হয়। মাথা ধরা যে কী ভীষণ ও নিজেও জানে। তাছাড়া এখন শ্যামলই এ বাড়িতে ওর একমাত্র আপনজন। ভূপতি থাকতে মনের দুঃখের কথা ওর কাছে বলে মাঝে মাঝে হাল্কা করত নিজেকে। শ্যামলের কাছে যদিও সব কথা বলা যায় না। তবুও মানসী বোঝে শ্যামল ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারে। তাছাড়া শুধু বৌদির দাবীই নয় মাঝে মাঝে শ্যামলের কথা শুনে একটা ছোট ভাইয়ের কথাই মনে হয় মানসীর। সবার ছোট এই দেওরটিকে তাই মানসীও ছোট ভাইয়ের মতই দেখে।

পায়ে পায়ে আবার শ্যামলের কাছে এসে মানসী বলে, নাও শুয়ে পড়। দেখি মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।

দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্ল। মানসীর হাত ধরে নিজের মাথায় রেখে শুয়ে পড়ে শ্যামল।

কানের পাশের রগ দুটো সত্যি ফুলে উঠেছে শ্যামলের। হাত দিয়েই টের পায় মানসী। এক মাথা রুক্ষ চুল। মাথাটাও গরম। চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে দেয় মানসী। কপালও মাঝে মাঝে টিপে দেয়। মানসীর হাতের স্পর্শে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে শ্যামল।

শ্যামলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার একটু অতীত স্মৃতিই রোমন্থন করে মানসী। ওর বিয়ের সময় শ্যামল কেমন ছেলেমানুষী করেছিল, হঠাৎই সেই একটা কথা মনে পড়ে যায়। সুব্রতর সঙ্গে একা কথা বলার সময় কেমন চুপিসারে শ্যামল গিয়ে সব শুনত। আর তারপর সুব্রত অফিসে বেরিয়ে গেলে ওদের দুজনার সব কথা আবার মানসীর সামনে অভিনয় করে দেখাত। ভীষণ ফাজিল শ্যামলটা। সব সময় মানসীর পিছনে লেগেই থাকত তখন। এখনও অবশ্যি সে সব বাদ যায়নি। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু ভারিক্কী হয়েছে কথা বলার ধরন। তফাৎ শুধু এইটুকু। আর সব ঠিক আগের মতই আছে।

মানসীর মনে হল শ্যামল বোধ হয় এই ভর সন্ধ্যেবেলা ঘুমিয়েই পড়ল। মাথা টিপে দিতে দিতে ও একটু ঝুঁকে শ্যামলের মুখে হাত রেখে ডাকল,

এই শ্যামল—শ্যামল—ঠাকুরপো—ঘুমুলে নাকি।

ঘুম ঘুম আবেশের মধ্যে দু'হাত দিয়ে মানসীকে জড়িয়ে ধরে শ্যামল। তারপ: বলে,

না ঘুমোই নি। তুমি আর একটু মাথা টিপে দাও বৌদি। বেশ ভাল লাগছে

হুঁ তাতো লাগবেই। বৌদির নরম হাতের মাথা টেপা ভাল না লেগে পারে। কই আমি যে তখন বললাম, মাথা ধরে থাকলে বল কপালটা টিপে দি তখন তো বললি, জ্বর ছেড়ে গেলে মাথা ধরাও চলে যায়। সুন্দর মুখ দেখে আবার বুঝি নতুন করে মাথা ধরল।

ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে বিস্মিত আর হতবাক করে দিয়ে প্রদীপ হাতে ঘরে ঢোকেন রাঙ্গামাসিমা। লজ্জায় ঘৃণায় কুঁকড়ে যায় মানসী। শ্যামলের মত মুখফোঁড় ছেলের মুখেও কোনও কথা জোগায় না। শ্যামলের পাশে একই ভাবে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে মানসী। রাঙ্গামাসীমা ঠাকুর ঘরের সামনে প্রদীপটা রেখেই আবার ঘুরে আসেন। এবার চকিতে উঠে দাঁড়ায় মানসী। ওকে লক্ষ্য করেই আবার বলেন,

তাইতো বলি এতক্ষণ সময় উপরে কিসের এত কথা হচ্ছে দু'জনার। তা এই যদি তোমার মনে ছিল তা হলে বিয়ে দিয়েছিল কেন মামারা। বললেই তো পারতে লেখাপড়া শিখিয়ে কাজে লাগাতে পারত। আমার এক ছেলেকে পর করেও আশা মেটেনি তোমার। আরও চাই।

এ সব কি বলছেন আপনি। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না মানসী। রাঙ্গামাসীমার প্রায় মুখোমাখি এসে দাঁড়ায়। মানসীর কথা শুনে আরও রেগে ওঠেন রাঙ্গামাসিমা। হাত নেড়ে বলেন,

যা বলছি তা বুঝতে না পারার মত কচি খুকি তুমি নও। তবে এটা ভাল করে শুনে রাখ আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত আর কোনও ফষ্টি-নষ্টি এ বাড়িতে চলবে না।

মা—এ তুমি কি শুরু করলে বল তো, প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বিছানা থেকে নীচে নামে শ্যামল। রাঙ্গামাসিমা শ্যামলের কথার জবাব না দিয়ে আবার বলেন,

অনাদিও আমাকে বলেছে। তোমাদের যদি এখানে থাকতে ভাল না লাগে তাহলে সুবিকে বলে অন্য পথ দেখ। এভাবে এক সঙ্গে থেকে আমার সংসার আর রসাতলে দিও না, দোহাই তোমার।

সংসার আমি রসাতলে দিচ্ছি না আপনি দিচ্ছেন। যখন তখন, যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছেন। মেজ ঠাকুরপোর ওই কেলেংকারীর জন্যও আপনি সবার কাছে আমাকে অপরাধী করে তুলেছিলেন। আবার শ্যামলকে নিয়েও আজ এমন

কথা মুখে আনলেন যেটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। একসঙ্গে কথাগুলো বলে কাঁপতে থাকে মানসী। রাঙ্গামাসিমাও চুপ করে থাকেন না। গলার স্বর তীব্র করে বলেন এবার,

বেইমান না হলে, কেউ চোখের সামনে অন্যায় করেও কথা বলতে পারে!

কিসের অন্যায়? রাঙ্গামাসিমার আরও কাছে এগিয়ে যায় মানসী। শ্যামল ঘরের আলোটা জেবলে দরজার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মানসীর ওই অনমনীয় ভাব দেখে খুব ভয় পেয়ে যায় ও। ফুলদা অনাদি কেউই বাড়িতে নেই। একটা চরম অঘটন বোধ হয় এখুনি ঘটবে। শ্যামলের চিন্তার মধ্যেই মানসীর দিকে হাত তুলে রাঙ্গামাসিমা বলেন,

সে সব যা বলার আমি সুবিকেই বলব। তোমার সঙ্গেও কথা বলতে আমার ঘেন্না হয়।

না—সুবি নয় আমাকেই বলতে হবে। কি এমন অন্যায়ের কাজ আপনি দেখলেন আমাকে করতে। মানসীর এই কথার পরই অঘটনটা ঘটল।

ঘটনাটা যে এত আকস্মিক ঘটে যাবে সেটা মানসী আর শ্যামল কেউই বুঝতে পারে নি। মানসীর চোখ মুখের চেহারাই তখন আলাদা। রাঙ্গামার কথা তো বলারই নয়। এ ভাবে মুখের ওপর কথা আর কোনও দিন বলে নি মানসী। আজ যেন সত্যিই সহ্য শক্তির সীমা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। মানসীকে খোঁচা দিয়ে কথা তো রাঙ্গামাসিমা আজই নতুন বললেন না। তবুও আজকের আঘাতটা যেন বড় বেশী করে বাজছিল বুকে। তাই তো চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে রাঙ্গামার অতখানি কাছে গিয়ে কথা বলছিল মানসী। মানসীর এবারের কথা শুনে রাঙ্গামাসিমা হঠাৎই ওর একটা হাত ধরতে যাচ্ছিলেন। মানসী এক ঝটকায় হাতটা ঠেলে দিতেই পড়ে গেলেন রাঙ্গামাসিমা। আর তারপরই বুক ধরে চিৎকার শুরু করলেন।

হতবুদ্ধি শ্যামল দৌড়ে এল মায়ের কাছে। বিমূঢ় হয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল মানসী। তারপর অবস্থার গুরুত্ব বুঝেই রাঙ্গামাসিমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই অবস্থাতেই দরজার কাছে অনাদি এসে বলল, কি ব্যাপার কি হয়েছে, মা অমন করছে কেন?

লজ্জায় মানসী আর মুখ তুলতে পারে না। শ্যামল শুধু বলে, কিছু না হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তাই—

তাই কি—?

কি করে বলব। তুই একটু কাছে বোস, আমি ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আসি। অনাদির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় শ্যামল তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অনাদি এসে রাঙ্গামাসিমার কাছে বসে। মানসী সরে দাঁড়ায়।

রাংগামাসিমা অনাদিকে দেখেই বুকে হাত বোলাতে থাকেন। কথা বলতে অনাদিই নিষেধ করে। ধীরে ধীরে মা'কে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

আবার একটা অসহনীয় অবস্থা। এখন ঘর থেকে বাইরেও যাওয়া চলে না। ঘরে থাকাও কষ্টকর প্রয়াস। বিছানায় শুয়ে একটু আরাম বোধ করেন রাংগামাসিমা, অনাদিকেই বলেন, ওকে এ ঘর থেকে যেতে বল অনাদি।

সে যাবে, তুমি একটু চুপ করে থাক, কতবার তো বলছি। বাড়ির সব ব্যাপারে তুমি কথা বলতে যেও না। মার বুকে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় অনাদি। ওর কথা শুনেও বিস্মিত হয় মানসী। এই ক'দিনে-ই কতখানি বদলে গেছে। কি হয়েছে কিছুই জানে না। অথচ মানসীকে নিয়েই যে অঘটনটুকু ঘটেছে আর তাতে মানসীও যে দায়ী কথার মধ্যে সেটুকু বেশ গুছিয়ে বলল অনাদি।

আর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। শ্যামলের মত মানসীরও কপালের রগগুলো ফুলে দপ দপ করছে। মাথার মধ্যে বয়ে চলেছে একটা গরম লাভার স্রোত। নীচে নামতে গিয়েও আবার ঘুরে কেন যেন ঠাকুর ঘরের দিকেই গেল মানসী।

দরজা ভেজান ছিল। খুলে আলো জেলে ঠাকুরের আসনের সামনে বসল। পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীসারদামা'র বড় একটা ছবি ঠাকুরের আসনের পাশেই আছে। দক্ষিণেশ্বর থেকেই নিয়ে এসেছিলেন রাঙ্গামাসিমা। শ্রীরামকৃষ্ণ আর মা'র দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মানসী। চোখের জলের অঞ্জলি দিয়েই পুজো করে ঠাকুরকে। অনেক কিছু কথাও নিরব ভাষায় নিবেদন করে। মানসী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না ওর অন্যায়টা কোনখানে, তাই বার বার হাত জোর করে পতিতপাবন সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অকপটে প্রার্থনা জানায়, ঠাকুর তুমি তো অন্তর্যামী তোমার কাছে তো পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় সবই ধরা পড়ে। তুমিই রক্ষা করো ঠাকুর। এই অন্ধকূপের মালিন্য থেকে তুমি আমাকে হয় উদ্ধার কর আর না হয় তোমার চরণে আশ্রয় দাও।

মেসোমশাই বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে কথামৃত পড়ে শোনাত মানসী। ছোট ছোট গল্পের মধ্যে ভারি সুন্দর লাগত ঠাকুরের উপদেশ। মানসী কয়েকবার বলেওছে সুব্রতকে, কিছুই তো করলে না। এবার সময় থাকতে থাকতে চল বেলুড়ে গিয়ে দীক্ষাটা নিয়ে নি।

মানসীর কথা শুনে হেসে উঠেছে সুব্রত। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলেছে, মাথা টাথা খারাপ হল নাকি তোমার। এই বয়সেই দীক্ষার কথা ভাবছ।

ওমা দীক্ষা নিতে আবার বয়স লাগে না কি! ওই তো কথামৃতে পড়লাম ঠাকুর বলেছেন—,

এইরে ওইসব ঠাকুর দেবতার বই তুমি পড়ছ না কি! তবেই হয়েছে সংসার করা আর হলো না আমার। কোনদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখব, খাঁচা শূন্য। আমার সাধের মুনিয়া পাখি খাঁচা ছেড়ে বিবাগী হয়ে পালিয়েছে। মানসীকে কথা বলতে না দিয়েই জড়িয়ে ধরেছে সুব্রত।

আজ কিন্তু বার বার ঠাকুরের কাছে সমস্ত অন্তর দিয়ে সুব্রতর তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার কথাই কামনা জানাতে লাগল মানসী।

ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না। কলে বেরিয়েছেন। শ্যামল ফিরে এসে আবার মার কাছেই বসল। রাঙ্গামাসিমা এতক্ষণে শান্ত হয়েছেন। জামাকাপড় ছেড়ে অনাদিও মার মাথার কাছেই বসে আছে। একবার শুধু নীচে নেমে চা খেয়ে আসার সময় একটু গরম দুধ উপরে দিয়ে যেতে বলেছিল। শ্যামল ঘরে ঢোকার পর গ্লাসে দুধ নিয়ে টেবিলের উপর রাখল মানসী। উনুন ধরিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করছে। শ্যামল কি খাবে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে আবার নীচেই নেমে এল মানসী।

সুব্রত ফিরল প্রায় ন'টার সময়। বেশ হাসিখুশী লাগছিল ওর মুখ। হয়ত যে কাজে গিয়েছিল সেটা ভালভাবেই মিটে গেছে। স্টেশনে নেমে একটা বড় রজনীগন্ধার মালা কিনে এনেছে! রাঙ্গামাকে খুশী করার জন্যই বাজার থেকে মাঝে মাঝে ফুলের মালা কিনে মেসোমশাইর ফটোতে পরিয়ে দেয়। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই একটা অন্য সুরের শব্দ বুঝতে পারে সুব্রত। নীচের ঘর অন্ধকার। মানসীও রান্নাঘরে নেই। কি হ'ল আবার।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালে। বিছানার উপুর হয়ে শুয়েছিল মানসী। আলো জ্বলতেই উঠে বসে। ওর চোখ মুখ তখনও বেশ ফুলে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার ফলেই এই অবস্থা। সুব্রত কিছুই বুঝতে পারছে না। আবার এখন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই যদি অবুঝ হয়ে ওঠে মানসী। তাই কি যে করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সুব্রত। আলনা থেকে লুঙ্গিটা এগিয়ে দিয়ে মানসীই বলে,

এত রাত হল তোমার, কোথায় গিয়েছিলে?

সে অনেক কথা, তোমাকে সব বলব। আর জান এবার আর রাঙ্গামা কোনও কথা বললে শুনছি না। তোমাকে নিয়ে সামনের মাসেই বেড়াতে যাব!

সে যেও—এখন মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসবে? নাকি ভূপতির ওখান থেকেই খাওয়ার পাট সেরে এসেছ!

তুমি জানলে কি করে আমি ভূপতির বাসায় গিয়েছিলাম? বিস্মিত হয়েই মানসীর মুখের দিকে তাকায় সুব্রত। মানসী সেই একই ভাবে বলে,

তুমি কি মনে কর বেশী লেখাপড়া শিখিনি বলে তোমাকে বিচার করার মত বুদ্ধিও আমার হয়নি।

আরে না-না আমি আবার সে কথা কখন মনে করলাম। তবে কি জান কথাটা প্রথমে তোমাকে বলিনি ইচ্ছে করেই। রাঙ্গামার মনের অবস্থা বুঝেই আমি ঠিক করেছিলাম ছুটি থাকতে থাকতেই ভূপতি আর তনিমাকে এ বাড়িতে তুলে আনতে হবে। আর ওদের সব ব্যবস্থা করে নিয়ে আসার দিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে অবাক করে দেব।

তা হ'ল কিছু। সুব্রতর উচ্ছ্বাসের মাঝখানেই আবার প্রশ্ন করে মানসী। সুব্রত ঠিক মানসীর মুখের ভাষা বুঝতে না পারলেও ওর জানার আগ্রহ দেখে, এক এক করে সবই বলে যায়। সুব্রতর কথা যে এখনও ভূপতিরা শোনে সে কথাটা বার বার জোর দিয়েই বলল মানসীকে। কথার মধ্যেই কাপড় ছেড়ে বিছানায় বসেছে। শেষে হাসতে হাসতেই বলে সুব্রত,

জান ওদের দু'জনার বেশ ভাল মিল হয়েছে। তনিমাও বেশ গুছিয়ে সংসার করছে। আমাকে তো কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না। শেষে অনেক বলার পর তাও এক গাদা লুচি তরকারি মিষ্টি খাওয়াল। আর জান ছেলেটা যা সুন্দর কথা বলে না। আমি যাওয়া অব্দি তো আমার কাছেই ঘুর ঘুর করছিল। ভূপতি আবার জেঠু বলে ডাকতে শিখিয়েছে। আলাপ জমে উঠতেই সারাক্ষণ শুধু জেঠু জেঠু বলে পাগল করে তুলছিল। এমন আধ আধ মিষ্টি ডাক না তোমাকে কি বলব।

সুব্রতর কথার মধ্যেই বিছানায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মানসী। বিব্রত হয়েই কথা বলা বন্ধ করে সুব্রত। হঠাৎ যে আবার কি হল মানসীর বুঝতে পারে না। বেশ তো মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই শুনছিল এতক্ষণ। ছেলেটার কথা বলতেই হঠাৎই যেন মানসীর ব্যথার ছবিটা দেখতে পায় সুব্রত। মানসীকে কাছে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয় মানসী। এতক্ষণ শুধু নিজের সঙ্গে যুদ্ধই করে গেছে। সন্ধ্যে বেলায় রাঙ্গামার ওই অহেতুক কথার আঘাতগুলো এখন সুব্রতকে কাছে পেয়ে আবার নতুন করে অনুরণন তুলছে মনের মধ্যে।

খিদে না থাকলেও মানসীর সঙ্গেই বসতে হয় সুব্রতকে। আর খেতে খেতেই আবার বলে ভূপতি রাজি হয়েছে এখানে আসতে। তনিমা নাকি অনেকদিন থেকেই ওকে বলছিল। দু'জনে মিলে মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে রাঙ্গামা নিশ্চয়ই অবুঝ হতে পারবেন না। তাছাড়া এতো হামেশা ঘটছে। প্রায় ঘরেই আছে বলতে হবে। এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না এখন। তা ছাড়া বাড়িতে একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেও আসবে। সুব্রতর সব কথাই এবার মন

দিয়ে শোনে মানসী। তবে ওযে আর এ বাড়িতে থাকবে না। এই জেদটা মনের মধ্যে জোর করেই ধরে রাখে।

অনাদি নীচে এসে সুব্রতকে দেখে ওর ঘরে শুয়ে পড়েছে। মা'র কথা কিছুই বলে নি সুব্রতও এতক্ষণ ভূপতি তনিমা আর ওদের ছেলের গল্পেই মেতে ছিল। বিছানায় শুয়ে মানসীই মুখ খুলল।

একে একে সন্ধ্যেবেলার সেই নাটকীয় ঘটনার সব কথাই খুলে বলল মানসী। মানসীর মুখে শুনতে শুনতে সুব্রতও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শেষের কথাগুলো বলে আবার গুমড়ে কেঁদে উঠল মানসী। তারপর সুব্রতর বলিষ্ঠ চওড়া বুকের মধ্যে কান্নাভেজা মুখ রেখে বলল,

এর পরও তুমি আমাকে এখানে থাকতে বল। যে শ্যামলকে আমি ছোট ভাই ছাড়া আর কিছু ভাবি না। তাকে নিয়ে এই নোংরামি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি এবার আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।

মানসীর কথার কোনও জবাবই দিতে পারে না সুব্রত। পরিস্থিতি যে এতখানি ঘোরাল হয়েছে সেটা বাড়িতে ঢুকে কিছুই বুঝতে পারে নি। তবুও রাঙ্গামার কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই হয়। ও তাই বলে, রাঙ্গামা এখন ভাল আছেন তো? ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?

না শ্যামল ডাকতে গিয়েছিল? পায় নি। পরে তো দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছেন। অনাদির কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল তো ভালই আছেন।

কি খেলেন?

এক গ্লাস দুধ দিতে অনাদিই বলেছিল। আমি দিয়ে এসেছি উপরে। তা সে যাক, তোমাকে যা বললাম তার ব্যবস্থা কিছু হবে কিনা বল? মানসী আবার একগুঁয়েমীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুব্রত যে এখন কি বলবে সেটাই চিন্তা করে। চুপ করে থাকা দেখে মানসী আবার বলে,

কি হল কথা বলছো না কেন?

না বললাম তো ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। তবে ভূপতিকে যে আসতে বললাম আর সামনের রোববার ওরা বাগবাজারের পাট চুকিয়ে এখানেই আসবে বলে কথা দিল আমাকে, তার কি হবে তাই ভাবছি!

তোমার রাঙ্গামাকে সে কথা কাল সকালে সব বুঝিয়ে বলবে। তিনি যা ভাল মনে করেন করবেন। মানসীর কথা শুনে হাসি পায় সুব্রতর। রেগে গেলে মেয়েটা যেন কেমন হয়ে যায়। মানসীকে আদর করে কাছে নিয়ে সুব্রত বলে,

তা না হয় বলব। তবে তনিমার ছেলেকে না দেখেই তুমি অন্য কোথাও যেতে পারবে?

জানি না যাও। সুব্রতর কাছ থেকে সরে যায় মানসী। কিছুক্ষণ মান অভিমানের পালাও চলে। শেষে অনেক কথার মায়াজালে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারে সুব্রত। আগামী দিনের অনেক কিছু অদেখা প্রতিশ্রুতির ছবিও এঁকে দেয় মানসীর অবুঝ মনে। নিজেকে একান্তভাবে সুব্রতর কাছে সমর্পণ করে মানসী এক নতুন সুরের জগতেই ভাসতে থাকে।

আজ খুব সকালে উঠেছে মানসী। গতকালের ক্ষুব্ধ মনটা আজ সকালের আলোয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকদিন পরে ভাল ঘুমও হয়েছিল কাল। অনাদি উঠে মুখ হাত ধুয়ে উপরে গেল। শ্যামল নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। সুব্রত তো অফিস না থাকলে বেলা আটটার আগে ঘুম থেকে উঠতেই চায় না। শুধু মেসোমশাইর মৃত্যুর পর থেকে কাজ পর্যন্ত ক'দিন সকালে উঠতে হয়েছিল।

ঠিকে ঝিয়ের সঙ্গে আজ বেশ রেগেই কথা বলল মানসী। স্রেফ জানিয়ে দিল এতবেলায় কাজে এলে সামনের মাস থেকে আর আসতে হবে না। সুব্রত জেগে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। চা খেয়েই উঠবে ভেবেছিল। কিন্তু মানসীর কথা শুনে উঠে বারান্দায় এল।

চা নিয়ে মানসীও ঘরের দিকেই যাচ্ছিল। শ্যামল নীচে নামছে। মুখ ধুয়ে শ্যামলকে নিয়েই ঘরে এল সুব্রত। চা খেতে খেতে আবার নতুন করে কাল রাত্রের অভিনয়ের কথাও শোনাল শ্যামল। হাসতে হাসতেই বলল, জানলে ফুলদা—বৌদি যা অভিনয় করেছে না কাল, আমাদের গ্রেট মাদার একেবারে আউট।

অভিনয় করা তো জানি না আমি, সত্যি কথা যা মনে এসেছিল তাই বলেছি। মানসী গম্ভীর হয়েই বলে। শ্যামলের ওকে রাগাতেই ইচ্ছে করে। তাই আবার বলে, তাই বলে ওরকম হাত পা নেড়ে স্টেজের অভিনয়ের মত বলবে।

হাসি ঠাট্টার মধ্যেই চা খাওয়া শেষ হয়। শ্যামলকে ভূপতির কথা সব বলে সুব্রত। রাঙামার কাছে কথাটা কি ভাবে বলা যায় দু'জনে সেই পরামর্শই করতে থাকে। অনাদিকেও সুব্রত বলতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্যামলই বলল, না—না, ওকে এখনই কিছু বলো না। পরশু তো রোববার। তুমি যা বললে আমি তাই করবো। আর কালও একবার যাব ওদের বাসায়। একেবারে বাড়িতে নিয়ে এলেই ও দেখবে।

সেটা কি ঠিক হবে। সুব্রতর মনে দ্বিধার ভাব থেকেই যায়। মানসী এবার বলে,

না ঠিক হওয়ার কি আছে। যে তোমাকে কিছু বলতে চায় না, কথা বলতে গেলে এড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে আবার পরামর্শের কি আছে। শ্যামল যা বলল সেটা করলেই ঠিক হবে।

রাইট—ম্যাডাম একেবারে কারেক্ট কথা বলেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আর কোনও আলোচনা নয়। ফুলদা তুমি বরং আজ মাকে দেখতে গিয়ে চান্স পেলে কথায় কথায় গ্রেট মাদারকে একটু আভাষ দিয়ে রেখ। তাহলেই কাজ হবে।

শ্যামলের কথায় হেসে ফেলে সুব্রত। বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাজারে যেতে হবে। কথার মধ্যে উপরে চা দিয়ে এসেছে মানসী। কাপ ডিস আনতে হবে। শ্যামল বেরিয়ে যেতেই উঠে পড়ে মানসী। রান্না ঘরের দিকেই যায় আবার।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করতে থাকে সুব্রত। ভূপতির কথাটা রাঙ্গা-মাসিমাকে কি ভাবে বলা যেতে পারে তার একটা খসড়াই মনে মনে তৈরী করতে থাকে।

দুপুরটা ভালই কাটল আজ। সকালে রাঙ্গামার ঘরে গিয়ে ভূপতির কথাটা বলি বলি করেও বলতে পারে নি সুব্রত। অনাদি থাকাও একটা কারণ। আবার রাঙ্গামার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই যেভাবে সুব্রতকে কথা শোনালেন তাতে একটু লজ্জাই করছিল ওর। কথা আর কি! সবার সঙ্গেই মানসীর দোষ মিশে আছে। সবশেষে বললেন, আমার আর ভাল লাগছে না সুবি। অনাদিকে বলে বলে তো পারছি না। তুই না হয় তিনমাসের কাজটা মিটে গেলে আমাকে কোথাও রেখে আয়। আর কিছু না হোক কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে তো আশ্রয় মিলবে। শুনেছি সেখানে নাকি আমার মত অনেক অভাগীই দিনপাত করছে।

সে দেখা যাবে। তিনমাসের তো দেরী আছে। তোমার যদি কাশীতে যেতে ইচ্ছে হয় আমি নিয়ে যাব। সুব্রতর এবারের কথা শুনে অনাদি আর বসে থাকে না সেখানে। বেলা হয়ে যাওয়ায় স্নান করতে চলে যায়। আরও কিছুক্ষণ রাঙ্গামাসিমার কাছে বসে কথা বলে সুব্রতও নীচে আসে। ভূপতির কথা রাঙ্গামাসিমাই দু'একবার তুলেছিলেন। কিন্তু সে তো রাগের মুখে। তাই তখন ভূপতির এখানে চলে আসার কথা বলতে পারে নি সুব্রত।

বিকেলে চুল বাঁধতে বাঁধতে মানসীই জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুরপোর কথা রাঙ্গামাকে বলেছ কিছু।

না—বলতে পারলাম না।

কেন?

তোমরাই তো বললে অনাদির সামনে কিছু না বলতে।

আহা সে কি সব সময় তোমাকে পাহারা দিয়ে বসেছিল নাকি? একটু পরেই তো নীচে নামল।

আমি ভাবছি কি জান—কথাটা তুমিই না হয় রাঙ্গামার কাছে বললে? মানসীর মন বুঝতেই বলে সুব্রত।

তীব্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মানসী বলে,

সত্যি যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে তাহলে বল শ্যামলকে বলে তার ব্যবস্থাই আগে করি।

মানসীর কথায় হেসে ফেলে সুব্রত। যদিও মানসী বুঝতে পারে ওকে রাগানোর জন্যই কথাটা বলেছে সুব্রত। তবুও এ সব কথা ভাল লাগে না আর। চুল বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সাবান নিয়ে কলতলার দিকে যাব বলেই পা বাড়ায়। সুব্রত ওকে ডেকে বলে, কথাটার কি হবে কিছু বলে গেলে না তো ?

কি আবার হবে, বলতে হয় বলবে, না হয় এলেই যা ঘটার ঘটবে। কথাটা বলেই আর দাঁড়ায় না মানসী। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাঙ্গামাও নীচে এসেছেন। সুব্রতকে কিছু বলার জন্যই বোধহয় এ ঘরের দিকে আসছিলেন। মানসীকে বেরতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মানসী কলতলায় যেতেই আবার ঘরের কাছে এলেন। রাঙ্গামাসিমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে সুব্রত। কাছে এসে বলে,

কি হয়েছে রাঙ্গামা—কিছু বলবে ?

হ্যাঁ বলব বলেই তো এলাম। তা তোমার আবার শোনার সময় আছে কি ? কথা বলতে বলতেই ঘরে ঢোকেন রাঙ্গামাসিমা। সুব্রত চেয়ার এগিয়ে দেয় সামনে। বেশ উৎকণ্ঠিত মুখেই রাঙ্গামাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,

কি বলবে বল না।

কথাটা তোমাকে বলব বলে কয়েকদিন হলই ভাবছি। তবে একলা তো পাই না। সব সময় তো গণ্ডির মধ্যেই বসে থাক। না ডাকলে এখন আমার কাছে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ। তা এই ভাবে বাড়ির বউয়ের সব অনাচার কি আমাকে সহ্যকরে চলতে হবে ?

রাঙ্গামাসিমার কথার কোনও মানেই ধরতে পারে না সুব্রত। বোকার মত তাই প্রশ্ন করে,

নতুন করে আবার কি হল। কালকের কথা তো আমি শুনেছি সব।

কি শুনেছ—আমি বউকে মারতে উঠেছি তাই শুনেছ তো ? রাঙ্গামা উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। সুব্রত সেটা বুঝেই বলে,

না—না তা শুনব কেন, তোমার হঠাৎই শরীর খারাপ হয়েছিল। শ্যামল ডাক্তার ডেকেও পায় নি। পরে সব ঠিক হয়ে গেছে, এই সব আর কি।

কেন আমার হঠাৎ শরীর খারাপ হল ? সেটা শোননি। রাঙ্গামাসিমার একথায় জবাব দেয় না সুব্রত। চুপ করে থাকে। আর তাইতেই উনি কিছু বুঝে নিয়ে চাপা স্বরে বলেন,

তোকে কি আমি পর ভাবি সুবি। তোর বউ কি আমার কেউ নয়! তোদের ভালমন্দ দেখা কি আমার কর্তব্য নয়। অথচ সভ্যতার কথা, ভালমন্দর

কথা তোর বউকে বলতে গেলেই সে আমাকে ধমকে কথা বলে। কাল তো মেরেই ফেলছিল। নেহাৎ সরে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেলাম তাই রক্ষে।

মানসীর গা ধোয়া বহুক্ষণ আগেই শেষে হয়েছিল। বিশেষ করে রাঙ্গামাসিমার ঘরে ঢোকার পরই ছটফট করছিল ওর মন। আবার কি কথা বলবেন সুব্রতর কাছে কে জানে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ চুপ করেই শুনছিল সব কথা। কিন্তু এবারে আর চুপ করে থাকতে পারল না। কথা শেষ করে রাঙ্গামাসিমা সুব্রতর দিকে তাকাতেই বেগে ঘরে ঢুকে ওদের সামনে আসে মানসী। তার পর সব কিছু উপেক্ষা করে গলায় জোর দিয়ে বলে,

আপনি না ঠাকুর পুজো করেন। জপও করেন ঠাকুরের সামনে বসে। অথচ মিথ্যে কথাগুলো বলার সময় একবারও ঠাকুরের কথা মনে হয় না।

কি বললে আমি মিথ্যেবাদী। মিথ্যে কথা বলছি আমি!

হ্যাঁ বলছেন। আর শুধু মিথ্যে কথা নয়। আমার নামে মিথ্যে অপবাদও সবার কাছে করে যাচ্ছেন। আমি যা নই দিন রাত শুধু তাই বলে বলে আপনি নিজেই ছোট হয়ে যাচ্ছেন।

শুনলি-শুনলি সুবি। তোর সামনেই বউ কেমন করে আমাকে অপমান করল। শুনলি তো সব। কালও ঠিক ওই রকমই করেছিল। আমার কি অপরাধ? না সোমত্ত বউ বয়সের ছেলের সঙ্গে বসে একা একা হাসি মস্করা করছে তাই বলেছিলাম। বাবা বাবা, বাপের জম্মে এমন মারমুখী বউ দেখি নি।

এবার দেখুন। মানসী রাগে ফুঁসতে থাকে। সুব্রত যে কাকে থামাবে ঠিক করতে পারে না। মানসীকেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মানসী আবার মুখ খোলে। রাঙ্গামাসিমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে বলে, মারমুখী বউ তো দেখলেনই এবার সে বিদেয় হলে, নতুন আর এক বউ আসবে কাল তাকে নিয়েই ঘর সংসার নতুন করে শুরু করুন।

কি কি বললে। রাঙ্গামাসিমাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। পরিস্থিতি খুবই ঘোরাল হয়ে উঠেছে। রাঙ্গামাসিমা একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চান। কিন্তু কথা আটকে যায়। সুব্রত এগিয়ে আসার আগেই কোনও রকমে মানসীকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান, মানসীর দিকে তাকিয়ে সুব্রতও যেন কেমন হয়ে যায়। ওকেও কিছু বলতে পারে না। পায়ে পায়ে মানসীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এতক্ষণের সমস্ত রাগ সুব্রতর ওপর গিয়ে পড়ে। পাগলের মত সুব্রতর জামা দুহাতে চেপে ধরে মানসী। তারপর প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, না—না—না—কিছুতেই না। আর তুমি এ ভাবে আমাকে মার খাওয়াতে পারবে না। আর এক মুহূর্তও আমি থাকব না এবাড়িতে।

সুব্রতর বুকে মুখ রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মানসী। ওকে এখন সান্ত্বনা

দেবার মত কথাও জোগায় না সুব্রতর মুখে। তবে রাঙ্গামাসীমার এই একই ধরনের কথা শুনতে শুনতে ওরও আজকাল খুবই খারাপ লাগে। এখনকার কথাগুলোও কানে বিশ্রী লেগেছিল। মানসী এ ভাবে ঘরে ঢুকে কথা না বললে আজ হয়ত সুব্রত নিজেই রাঙ্গামাসিমার কথার প্রতিবাদ জানাত। কিন্তু এখন তো সব কিছুর বাইরে চলে গেছে ঘটনা। মানসীকে আজ হয়ত কিছুতেই শান্ত করা যাবে না।

অনাদিও ফেরেনি অফিস থেকে। শ্যামল আবার বোধহয় ভূপতির ওখানেই গেছে। ওকে অবশ্য আজ যেতেই বলেছিল সুব্রত। কারণ ভূপতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেদিন তনিমার দাদাও এসেছিলেন ও বাড়িতে। তার সঙ্গেও কথা বলে সব বুঝিয়ে বলেছিল সুব্রত। তনিমার দাদা তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান কথা শুনে। তনিমারও আপত্তি নেই। আসার সময় ভূপতি শুধু বারবার বলেছিল, একা একা সব দিক ঠিক মত গুছিয়ে নিতে পারবে না ও। তাই শ্যামল যদি আগের দিন আসে তা হলে খুব সুবিধে হয়।

মানসীর মাথায় নিরবে হাত বোলাতে থাকে সুব্রত। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে টের পায় অনাদি এল। হঠাৎ যদি ও আবার এঘরে ঢোকে তাহলে খারাপ লাগবে। ধীরে ধীরে মানসীর মুখ তুলে কপালে আলতো করে একটু চুমু খায় সুব্রত। মানসী কেঁদেই চলেছে। সুব্রতর স্নেহ-চুম্বনে কান্না আরও বেড়ে যায়। চোখের জল কাপড় দিয়ে মুছিয়ে সুব্রত বলে, চুপ কর লক্ষ্মীটি। একটু চুপ কর এখন আমি কথা দিচ্ছি। কালই তোমাকে নিয়ে কোথাও যাব। না হয় টুলুপিসিমার কাছেই কয়েকদিন থাকব আমরা। তারপর যা ভাল হয় করা যাবে!

সুব্রতর কথা শুনে বড় বড় চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মানসী। তারপর ছোট মেয়েদের মত আব্দারের সুরে বলে, ঠিক বলছ—আমার গা ছুঁয়ে বল।

মানসীর কথায় হেসে সুব্রত বলে, গা নয় এই তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি কাল সকালেই টুলুপিসিমার বাড়ি যাব-যাব-যাব। এখন যাও একটু শুয়ে থাক।

তুমি কোথায় যাবে। সুব্রতকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায় মানসী। দরজার কাছে গিয়ে সুব্রত বলে, কোথায় আর যাব আমার তো পার্টি আর ক্লাব নেই। যাই বাজারের রাস্তায় এমনি একটু ঘুরে আসি।

সুব্রত চলে যেতেই নিরবতা নেমে আসে ঘরে। মানসীর এখন রান্নাঘরে যেতে ভাল লাগছে না। অনাদি অফিস থেকে এসে রাঙ্গামাসিমার কাছেই বসেছে। আবার হয়ত নতুন করে অনাদির কাছে মানসীর কথা বলা শুরু হয়েছে। মানসী একবার ভাবল আজ কিছুই রান্না করবে না। বুবুক সব। কিন্ত আবার সুব্রতর কথা মনে হতেই সে চিন্তা মনে ধরে রাখতে পারে না। শ্যামল যে কখন ফিরবে কে জানে।

ঘরের মধ্যে একা বসে নিজের মনের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে থাকে মানসী। কত কল্পনা ছিল ওর, সে সব একটাও বাস্তবে রূপ পেল না। তা সে যাক এই হয়ত ভবিতব্য। মানুষের সব চাওয়াগুলোই তো পূর্ণতা পায় না। বেশ কিছুক্ষণ একা বসে থেকে আবার বাইরে আসে মানসী। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকেই এগিয়ে যায়।

শ্যামল ফিরল অনেক রাত করে। প্রায় এগারটা বাজে। অনাদি একটাও কথা বলেনি সুব্রত বা মানসীর সঙ্গে। শুধু খাওয়ার সময় নীচে নেমেছিল। আজ বাইরেও যায় নি। শ্যামলের জন্যই বসেছিল মানসী। দেরী হওয়ার কথা সুব্রত জিজ্ঞাসা করতেই বলল,

আর বলো না তাড়াতাড়ি ফিরব বলেই তো ওদের বাসা থেকে সাড়ে সাতটায় উঠে পড়লাম। তা উঠলে হবে কি। শেয়ালদা এসে দেখি সাংঘাতিক কাণ্ড। লোকের ভিড়ে স্টেশন ভর্তি। গাড়ী বন্ধ। কী যেন গোলমাল হয়েছে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে রেল কর্মচারীদের। তাই নিয়ে এক তুলকালাম কাণ্ড চলেছে। শেষে আবার বাসে ঝুলতে ঝুলতে শ্যামবাজার। সেখানেও আর এক কাণ্ড। সবাই তো বাস ধরে বাড়ি ফিরতে চাইছে। কিন্তু অত বাস কোথায়। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন মিলে ট্যাকে করে বি-টি রোডে আসি।

তারপর? শ্যামল একটু চুপ করতেই প্রশ্ন করে মানসী। ওর দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত বলে শ্যামল,

তারপর আর কি হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর এসে একটা চেনা রিক্সা পেয়ে গেলাম।

তা যে জন্যে ভূপতির কাছে গিয়েছিলি সে সব ঠিক আছে তো।

সব ছবির মত সাজিয়ে দিয়ে এসেছি। ঠিক তুমি যেমন করে বলে দিয়েছিলে দু'জনে এক সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে স্ট্রেট মাদারের সামনে উপুর হয়ে পড়ে যাবে। তারপর বৌদিভাই আর তুমি অভিনয় করে যাবে। আর বাচ্চাটা—।

চুপ কর শ্যামল চুপ কর। এখন এসব কথা থাক। সুব্রত হঠাৎই গম্ভীর হয়ে ওঠে। শ্যামল কিছু বুঝতে না পেরেই ওর দিকে তাকায়। এবার—মানসী কথা বলে। খাওয়াও হয়ে এসেছে। এঁটো বাসনগুলো ঘরের একপাশে সরিয়ে রেখে হাত ধুয়ে—খাটে বসেই বলে মানসী,

তোমার ফুলদা আর আমাকে বাদ দিতে হবে ভাই। তাছাড়া যা বললে সবই ঠিক আছে।

মানে? প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকায় শ্যামল। মানসী পা দোলাতে দোলাতে বলে,

মানে কিছু নেই। অনেকদিন তো হল ভাই পুরনো ফেলে এবার নতুন বৌদিকে নিয়ে—মজার গল্প করবে। আমরা কাল সকালেই চলে যাচ্ছি।

কোথায় — ?

সে কথা তোমার ফুলদা জানে।

ও কিছু নয়। যা তুই শুতে যা, অনেক রাত হয়েছে। কাল তো আবার ওখানে সকালেই যেতে হবে। শ্যামলকে আর কথা বলার সুযোগ দেয় না সুব্রত।

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে শ্যামল। তারপর একটা কিছু বুঝে নিয়েই ও ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে। মনে মনে আসন্ন একটা ভাঙনের ছবি দেখে খুব ভয় পেয়ে যায় শ্যামল। যেমন করেই হোক এ ভাঙনকে রোধ করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? এই প্রশ্নটার আর সমাধান মেলে না। তা ছাড়া শ্যামল তো কোনওদিন বাড়ির সমস্যা নিয়ে এভাবে মাথা ঘামায়নি। তাই ও বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে।

চিন্তার মধ্যে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। হয়ত আজও মানসীর সঙ্গে রাঙ্গামার একটা প্রহসন হয়েছে। আর সেটা হয়ত খুবই খারাপ। হয়ত গতকালের সেই ঘটনাটাই আবার নতুন করে বলা শুরু করেছিলেন মা। না হলে মানসীর কথায় সুব্রত তো কোনও প্রতিবাদ করল না। তবে কি সত্যি ফুলদা ওদের ছেড়ে এবাড়ি থেকে চলে যাবে। না-না তা হয় না—কিছুতেই না। এত বড় অন্যায় হতে দেয়া যায় না। মনের পরিধিতে একটা সমাধানের ইঙ্গিত হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত উঁকি দিয়ে যায়। আর সেই হঠাৎ আসা আলোর রেখাটাই আবার ধরার জন্য আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে শ্যামল। দেরী হওয়ার জন্যই আজ ও অনাদির ঘরেই এসেছে। এত রাত্রে আর মা'র ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস হয় নি। অনাদি হয়ত ঘুমিয়েই আছে। আর না হয়—সব জেনে বা বুঝেও কথা বলতে চায়নি শ্যামলের সঙ্গে। যাই হোক একটা কিছু হবে।

রাত্রে শুয়ে আর বিশেষ কোনও কথা হয় না। সুব্রতকে জড়িয়ে ধরে আগামী দিনের এক সুখ স্বপ্নের ছবিই আঁকতে থাকে মানসী। তবে ওই রাত্রিতেই সুটকেশটা গুছিয়ে রাখতে ভুল করেনি। সুব্রতর জামা প্যান্ট আর ধুতিও নিয়েছে। সুব্রত সব দেখেও কিছু বলতে পারে নি। তা ছাড়া সত্যি ও নিজে এবার ঠিক করেছে কাল রাঙ্গামাকে বলেই কয়েকদিনের জন্য মানসীকে নিয়ে টুলু পিসিমার কাছে থাকবে। তারপর মানসীর মনটা শান্ত হলে ওকে বুঝিয়ে আবার না হয় নতুন করে সব শুরু করা যাবে।

তখনো ভাল করে ভোর হয় নি। মানসী এর মধ্যেই উঠে চা তৈরী করেছে। সুব্রত বিছানায় শুয়েই চা খেল। বাথরুমে যেতে হবে। তারপর তৈরী হয়ে রাঙ্গামার কাছে কথাটা বলতে হবে। সুব্রতর কথা শুনে আবার কি কাণ্ড ঘটবে কে জানে। শুয়ে শুয়ে সেই সব কথাই চিন্তা করছিল সুব্রত। মানসী দু'বার তাগাদা দিয়েছে উঠতে।

শ্যামলও বোধ হয় ওঠেনি ঘুম থেকে। না হলে বাইরে মানসীর চলার শব্দ শুনে ও ঠিক এ ঘরে চলে আসত।

সুব্রত উঠে পড়ে। সকাল হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে—তৈরি হতে হবে। আজ রবিবার। অনাদির অফিসের তাড়া নেই। সে হয়ত শুয়েই আছে। শ্যামলটা উঠছে না কেন। ওকে যে ভূপতির কাছে যেতে হবে। শ্যামলকে ডাকতেই অনাদির ঘরে যায় সুব্রত।

ঘরে অনাদি একা শুয়ে আছে। শ্যামল নেই। একটু ইতস্ততঃ করে অনাদির দিকে তাকিয়েই বলে সুব্রত,

ছোট কোথায় গেল!

কি জানি। রাত্রে তো শুয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গে আর বিছানায় দেখতে পাই নি। নির্লিপ্ত ভাবেই জবাব দেয় অনাদি। আবার একটা নতুন চিন্তা এসে সুব্রতর মাথায় আঘাত করে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে আসে। বারান্দাতেই মানসীর সঙ্গে দেখা হয়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী বলে,

কি হল—শ্যামল কোথায়?

জানি না—সব একসঙ্গে যুক্তি করে আমার মাথাখারাপ করে দেবে। নাও তুমি আব দেরী করো না। আমি এখুনি বেরব। কথাগুলো বলেই দ্রুত ঘরে গিয়ে ঢোকে সুব্রত।

মানসী একটু দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎই উপর থেকে নীচে নামেন রাঙ্গামাসিমা। মানসী তাড়াতাড়ি সরে আসে। রাঙ্গামাসিমা কিছু বুঝতে পারেন না। অনাদির ঘরেই যান।

একোবারে ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুব্রত। মানসীর কাছেই শোনে রাঙ্গামাসিমা অনাদির ঘরে আছেন। দরজার সামনে একটু সময় থেমে আবার ঘরে ঢুকে যায়। সুব্রতকে সকালবেলায় এই বেশে দেখে চমকেই তাকায় অনাদি। রাঙ্গামাসিমাও প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সুব্রত একবার দু'জনার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলে,

আমরা একটু টুলুপিসিমার কাছে যাচ্ছি রাঙ্গামা—ক'দিন থাকাব সেখানে।

তাতে আমার কি বলার আছে। বড় হয়েছ। বউ এসেছে। এখন আর আমার কথার মূল্য কী? আর আমি বাধা দেবারই বা কে?

এ তুমি ঠিক বললে না রাঙ্গামা! আমি তো আগেই বলেছিলাম। টুলুপিসিমার ওখানে ওকে কয়েকদিন রাখব। তখন তো তুমিও মত দিয়েছিলে।

আমার মতামতের যখন কোনও দামই তোমার বউ দেয় না। তখন তার কথা আর আমাকে বলতে এস না।

তবুও তুমি না বললে আমি যাই কি করে? কথাটা বলেই রাঙ্গামাসিমার পা ছুঁতে যায় সুব্রত। অনাদির খাটেই বসেছিলেন রাঙ্গামা। সুব্রত কাছে যেতেই পা তুলে নিয়ে বলেন,

থাক আর পেন্নামে কাজ নেই। বউকে নিয়ে যেখানে সুখে থাকতে যাচ্ছ যাও।

রাঙ্গা-মা। রাঙ্গামাসিমার এই ব্যবহারে প্রচণ্ড আঘাত পায় সুব্রত। একসঙ্গে সমস্ত দুঃখ আর অভিমানের আঘাত এসে নাচতে শুরু করে চোখের সামনে। কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। অনাদির সামনে যে এমন ব্যবহার রাঙ্গামা সুব্রতর সঙ্গে করবেন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ও। ছোটবেলার কথা খুব একটা মনে রাখে নি সুব্রত। বড় হয়ে ওঠার মুহূর্ত থেকে যাঁকে দেবী প্রতিমার আসনে বসিয়ে পুজো করে এসেছে তার কাছ থেকেই এল আজ চরম আঘাত। এ যেন ভাবাই যায় না।

সুব্রতকে এভাবে কথা বলতে রাঙ্গামাসিমাও চান নি। কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথা তো আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। আর কোনও কথা না বলে সুব্রত প্রায় ঝড়ের মত বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বারান্দায় সুটকেশ হাতে মানসীও দাঁড়িয়ে। ও ঘরের সব কথাই শুনেছে ও। কঠিন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানসীও যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। সুব্রতর কান্নাভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে তাই কিছুই বলতে পারে না মানসী।

সুব্রত থমকে দাঁড়িয়েই আছে। বার বার কানে বাজছে রাঙ্গামাসিমার কর্কশ কথাগুলো। এখন তো আর অন্য মন নিয়ে ঘরে ঢোকা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা অনাদির কাছেও ছোট হয়ে গেল সুব্রত আজ। অবরুদ্ধ কান্নার বেগ চেপে মানসীর দিকে তাকিয়ে—শুধু বলে, চল—।

ঘর থেকে সুব্রত বেরিয়ে যেতেই রাঙ্গামাসিমাও যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন, একবার অনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু—বলবেন বলেই ভাবেন। আবার কি মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি নিজেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ান। সুব্রতর কথায় চমকে ওঠেন এবার।

বারান্দা থেকে মানসীকে নিয়ে সুব্রত নীচে নামতেই কান্নার সুরে চিৎকার করে ওঠেন রাঙ্গামা,

সুবি-শোন, এ ভাবে যাসনে বাড়ি থেকে।

রাঙ্গামাসিমার কান্নার শব্দেই ঘুরে দাঁড়ায় সুব্রত। মানসীর এবার রাগ হয় ওর ওপর। কিছুতেই শিক্ষা হচ্ছে না লোকটার। ও সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। রাঙ্গামাসিমা ততক্ষণে বারান্দা থেকে নীচে নেমেছেন। সুব্রত প্রায় ছুটে কাছে যেতেই ওকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়েন। তারপর হঠাৎই সুব্রতর কোলে

মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে পড়েন। সুব্রত বিব্রত হয়ে অনাদির দিকেই তাকায়। আর মাথাটা তুলে ধরে অনাদি। রাঙ্গামা ইশারায় ওকে থামতে বলেন।

মানসী কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। সুটকেশটা নীচে নামিয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে শুধু। একবার ভাবে ও একাই চলে যাবে টুলুপিসিমার বাড়ি। মনের এই রকম অবস্থার মধ্যেই বাইরের দরজার একটা রিক্সা এসে থামে। ঘুরে সেদিকে চোখ রাখতেই চমকেই ওঠে মানসী।

ফুটফুটে সুন্দর একটি ডলপুতুলের মত ছেলেকে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে ভিতরে ঢোকে শ্যামল। মানসীকে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বারান্দায় মা ফুলদা আর অনাদিকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে প্রায় দৌড়েই ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

তনিমার ছেলেটা এতক্ষণ রিক্সায় বসে বেশ কথা বলছিল। বাড়িতে ঢুকেই ও যেন বোবা হয়ে গেল। শ্যামল আর কিছু বোঝার চেষ্টাও করে না। এতো প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও তাই ছেলেটাকে চুমু খেয়ে মানসীকে লক্ষ্য করেই বলে,

কি হ'ল অমন সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ কেন! নাও ছেলেটাকে একটু ধর। আমি দেখি মেজদারা দেরী করছে কেন আসতে। রিক্সাটা তো সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল।

শ্যামলের কথা শুনে ধীরে ধীরে উঠে বসেন রাঙ্গামাসিমা। ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে হাত ধরে শ্যামল। ওদের দেখে বোধ হয় ভয়ই পেয়েছে ছেলেটা, শ্যামলের হাতটা জোরে চেপে ধরে। তারপর হঠাৎই সুব্রতকে দেখে হেসে ফেলে একবার। দুষ্টুমিভরা মুখে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, জেঠু এইতা তোমাদেল বালি?

ওর কথা শুনে আনন্দে রাঙ্গামাসিমার দুই চোখও জলে ভরে ওঠে, আবার। পায়ে পায়ে মানসীও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে। তৃষ্ণার মেঘটা যখন এত কাছে চলে এসেছে তখন আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কতদিন যে এই রকমের একটি কচি শিশুর মুখের কথা শুনতে ইচ্ছে হয়েছে তা বলার নয়। মানসীকে দেখে শ্যামলের আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় ছেলেটা। সুব্রত উঠে ওকে কোলে তুলে নেয়। ঠিক সেই সময়ই ভিতরে আসে ভূপতি আর তনিমা।

ওদের দেখে আবার গম্ভীর হয়ে যান রাঙ্গামাসিমা। সুব্রত সেটা বুঝেই শ্যামলকে গায়ে ধাক্কা দেয়। শ্যামল যাওয়ার আগেই মানসী এগিয়ে যায় ওদের দিকে। তনিমার হাত ধরে নিয়ে আসে। সুব্রতর ইশারা বুঝে ভূপতি মার পায়ে হাত দেয়। সংগে সংগে তনিমাও এসে প্রণাম করে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েন রাঙগামাসিমা। ভাল মন্দ কোনও

কথাই আর বেরয় না মুখ দিয়ে। অনাদি শুধু ঘরে ঢুকে যায়। সুব্রতর কোলে চুপ করে থাকতে ছেলেটির বোধ হয় ভাল লাগছিল না আর! ও তাই হাত দিয়ে সুব্রতর মুখ ধরে আবার মিষ্টি সুরে বলে, বল না জেঠু এতা তোমাদেল বালি ?

ওকে আদরে জড়িয়ে ধরে চোখের জল মুছে সুব্রত বলে, না জেঠু আমার নয় এটা তোমার বাড়ি। কথাটা বলেই মানসীর দিকে এগিয়ে দেয় ছেলেটিকে। দু'হাত বাড়িয়ে পরম আকুলতায় ছেলেকে কোলে তুলে নেয় মানসী। কান্নায় দু'চোখ ওরও জলে ভরে উঠেছে। ছেলেটি কিছু বুঝতে পারার আগেই ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় মানসী।

নীড়ের পাখিরা সবাই নীড়ে ফিরে এসেছে আবার। আজকের প্রভাত যেন নতুন আলোর সন্ধানই এনে দেয় ওদের সবার জীবনে। ভূপতির ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর যে অন্ধকারের জগতে এ বাড়ির প্রতিটি মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজ সকালের উজ্জ্বল আলোয় সেই অন্ধকার দূরে সরে গেছে। তনিমা আর তার ছেলেকে দেখে রাঙ্গামাসিমাও যেন নতুন এক জীবনেরই ইঙ্গিত খুঁজে পান। এক-সঙ্গে থাকলে এরকম ভুল বোঝাবুঝি তো প্রতিটি সংসারেই হয়ে থাকে। তা ছাড়া সুব্রত আর মানসী ছাড়া তিনি থাকবেন কি করে এ বাড়িতে ? ওরা যে তাঁর সন্তানের চেয়েও বড়। প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এ কথা তো বলে বোঝাবার নয়, এ শুধু অন্তরের উপলব্ধি। তাই সব ভুল বোঝার অবসান ঘটিয়ে তনিমাকেই আগে নিজের কাছে টেনে নেন রাঙ্গামাসিমা।

শ্যামল খুব খুশী! ও যে এত তাড়াতাড়ি সবাইকে নিয়ে আসতে পেরেছে সে একটা চরম আনন্দ! আর সব চেয়ে বড় কথা মানসীর আর কোনও রাগ নেই মনে। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শ্যামলই প্রথম কথা বলে। মানসী তো কাছে নেই। তাই ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে জোরেই বলে ওঠে,

কি ব্যাপার রে বাবা এতখানি বেলা হল। একটা রাজ্য জয়ও করে ফেললাম তবু এককাপ চায়ের দেখা নেই। আজ এ বাড়ির হ'ল কি ? সব কি পালাল বাড়ি থেকে।

শ্যামলের কথা শুনে রাঙ্গামাসিমাও হেসে ফেলেন আর সেটা দেখেই শ্যামল আবার বলে,

. না-না-হাসি নয় মাদার হাসি নয়। এই তোমার আস্কারা পেয়েই বউ গুলো মাথায় উঠে যাচ্ছে। তুমি একটু শক্ত হাতে শাসন করো তো এবার।

সুব্রত কিছু বলতে গিয়েও পারে না। একবার শুধু শ্যামলের মাথায় ছোট্ট একটা চড় মারে। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে জোরে হেসে ওঠে।

শেষ